# সরল উপনিষদ।

## ঈশোপনিষৎ।

শ্রীষোড়শীচরণ মিত্র।

# সরল উপনিষদ

## ( ঈশোপনিষৎ )

মূল, শঙ্করভাষ্যাবলম্বনে অন্বয়, টীকা,
বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ও বঙ্গানুবাদ
এবং

শ্রীষোড়শীচরণ মিত্র।
কর্ত্তৃক

সরল ব্যাখ্যা সমেত।

২০শে আশ্বিন ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রকাশক—
শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র।
৪৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার
শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না।
মিত্র প্রেস
৪৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

# ভূমিকা

বেদ আর্য্যজাতির অতি আদরের ধন। বেদ শব্দ বিদ ধাতু হইতে উৎপন্ন, বিদ অর্থে জ্ঞান। অতএব বেদ অর্থে জ্ঞান। জ্ঞান মধ্যে যে জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাই বেদে নিহিত আছে; বেদ ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতেছে ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান। ইহা আরোহণ দ্বারা পরমাত্মজ্ঞানে উপস্থিত হইতে পারা যায়। ব্রহ্ম নিত্য অনাদি ও অনন্ত সুতরাং এই জ্ঞানও নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। বেদপাঠে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ধ্যান ও সাধনার সহিত বেদপাঠ করিতে হইবে। কেবল সাধারণ পাঠ দ্বারা অর্থজ্ঞান লাভ করিলেই বেদপাঠ হয় না উহার প্রত্যেক মন্ত্রটী ধ্যান করিতে হইবে; পবিত্র হৃদয়ে বাসনা শূন্য হইয়া মনের বাহ্যগতি রোধ করিয়া একমনে ধ্যান দ্বারা উহার প্রকৃত অর্থ বোধ হইবে এবং বেদরূপ সোপান অবলম্বনে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিতে পারিবে।

কোন কোন ইউরোপীয়ের মতে বেদ অসভ্য বর্ব্বর জাতির কল্পিত দেবতার ভীতিবিহ্বল স্তুতিগান। তাহারা কেবল বেদের বাহ্যিক পাঠ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে প্রকৃত অর্থজ্ঞান তাহাদের হয় নাই। কিরূপে হইবে? প্রাচ্য-জ্ঞান লাভের জন্য যে ধ্যান ও সাধনা প্রয়োজন তাহা তাহারা অবলম্বন করে না বা করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা নাই কেবল সংস্কৃত শব্দের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিলেই বেদপাঠ হইল না। উহার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা বহু আয়াসসাধ্য; ব্রহ্মজ্ঞানের পথিক ভিন্ন অপরে সে আয়াসে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। যাহারা সামান্য পরিশ্রমে বিদ্যার আলোচনা করিতে চাহে, যাহারা সংসারের নানা কর্ম্মে নিমজ্জিত থাকিয়া ব্যস্ত মনে মধ্যে মধ্যে বেদ পড়িতে চাহে তাহার জন্য বেদ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন না। যাঁহাদের শরীর ও মন পবিত্র, যাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি অতীব বলবতী, যাঁহারা বিষয় ভোগলিপ্সা কতক পরিমাণে সংযত করিয়াছেন, তাঁহারাই বেদের প্রকৃত অর্থ জ্ঞানে সমর্থ অতএব তাঁহারাই বেদ পাঠের অধিকারী। যাহারা অপবিত্র খাদ্য দ্বারা শরীরকে অপবিত্র করিয়াছে যাহারা মনকে পাপচিন্তা হইতে বিরত করিতে পারে নাই, যাহারা ঘোরতর সংসারী ও স্বার্থপর এবং বিষয় ভোগে নিমজ্জিত তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অযোগ্য অতএব বেদপাঠের অনধিকারী। সুতরাং গোখাদক বহির্বিদ্যার উপাসক ঘোরতর স্বার্থপর ও বিষয়ী, আত্মম্ভরী

ইউরোপবাসী যে বেদমন্ত্র ঘৃণা চক্ষে দৃষ্টি করিবে এবং বেদোপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এইজন্যই প্রাচীন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন বেদে শূদ্রের অধিকার নাই। তবে যিনি জন্মত শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণ যোগ্য গুণে ভূষিত তাঁহাকে শূদ্র বলা অন্যায়, তাঁহার পক্ষে বেদপাঠে মানা নাই।

উপনিষদ বেদের সারাংশ। উপনিষদ শব্দ উপ পূর্ব্বক নি পূর্ব্বক যদ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে উহার অর্থ সত্বর নিশ্চয় ভাবে যাহার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ উপনিষদ দ্বারা শীঘ্র নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। অতএব সাধক মাত্রের পক্ষেই উপনিষদ পাঠ একান্ত আবশ্যক। শ্রীমদভগবদ্‌গীতাকেও উপনিষদ বলা হইয়াছে, যদিচ গীতা বেদের অংশ নহে তত্রাচ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিধায় উহা মহাভারতের অন্তর্গত হইলেও উহা উপনিষদ। বলা বাহুল্য উহা দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থীর পক্ষে উহাই প্রথম পাঠ্য পুস্তক। তৎপরে বেদের সংহিতা ও উপনিষদ পাঠ্য।

উপনিষদ স্থানে স্থানে অতি দুরূহ, উহার অর্থবোধ অতি কঠিন; পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যও অনেক স্থলে এরূপ ভাবে লিখিত যে তাহার সম্যক অর্থজ্ঞান বহু আয়াস সাধ্য এবং বর্ত্তমান কালে ভারতবাসী ইউরোপবাসীর অনুকরণে গভীর চিন্তা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা উপার্জ্জনে অসমর্থ। ইউরোপ প্রদিষ্ট পথ অবলম্বনে আমরা কেবল অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে চাই। কিন্তু যে জ্ঞান উহার অতীত যে জ্ঞান কেবল অবেক্ষণ পরীক্ষণ দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য নহে, পরন্তু তাহা ব্যতীত ধ্যান ধারণা ও সাধনা আবশ্যক তাহা প্রাপ্তির চেষ্টা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে। এইজন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উপনিষদের সরল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা উপনিষদের কথঞ্চিৎ রস আস্বাদন করিতে পারিলে উপনিষদ পাঠের আকাঙ্ক্ষা বৰ্দ্ধিত হইয়া উহার প্রকৃত অর্থ জ্ঞান জন্য ঔৎসুক্য জন্মিবে ইহাই এই ক্ষুদ্র ব্যাখ্যাকারের উদ্দেশ্য। উপনিষদ পাঠে যে কেবল পরলোকের কার্য্য হইবে তাহা নহে; ইহাতে ইহলোকেরও লাভ আছে। মনুষ্য উপনিষদ প্রদত্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মন হইতে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণ দূরীকৃত হইয়া মানবকে দেবভাবে উপনীত করিবে; তদ্দ্বারা মানবের সুখ বৃদ্ধি করিবে ও সাংসারিক দুঃখে শান্তি প্রদান করিবে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ যোগবলে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মহাবাক্য নিহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য প্রাপ্ত হন। তাঁহারা এই সত্যই উপনিষদে নানা ভাষায়, নানা ভাবে পুনঃ পুনঃ

উক্তিদ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ মহাবাক্যের অর্থ, এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। এই সমস্ত বিশ্বসংসার যাহাতে কত মানব কত জীব জন্তু কত উদ্ভিদ ও প্রস্তরাদি দ্রব্য আছে সমস্তই প্রকৃত পক্ষে একই পদার্থ পরমাত্মা পরব্রহ্মের প্রতিরূপ মাত্র। এই যে অসংখ্য জড় ও জীব চতুর্দ্দিকে অসংখ্য নাম ও রূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে তাহা সমস্তই সেই পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি এবং পরে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে; এ সকল তিনিই। তাঁহা হইতে ইহাদের পৃথক সত্বা নাই। তিনি এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করিয়া বিশ্বলীলা প্রদর্শন করাইতেছেন এবং সময় আগত হইলে এই অনিত্য বিশ্বলীলা সম্বরণ করিবেন ও এই সকল বস্তু তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে।

উপনিষদ পাঠে এই সত্যের সম্যক উপলব্ধি হইবে। মানবমণ্ডলীর মধ্যে এই সত্যের যতই বিস্তার হইবে ততই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রেম, অপর জীবে দয়া, পাপে ঘৃণা, পাপীর প্রতি অহিংসা মানব হৃদয়ে গাঢ়রূপে গ্রথিত হইবে। অতএব উপনিষদ পাঠ সকলেরই কর্ত্তব্য।

অধুনা শিক্ষিত ভারতবাসী ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবল আকর্ষণে নিতান্ত স্বার্থপর ও ঘোরতর বিষয়ী হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব একেবারেই লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মে অথবা কোন ধর্ম্মেই তাহাদের আস্থা নাই; ধর্ম্মাচরণে তাহারা একান্ত উদাসীন; ভারতবাসীর হৃদয়ে যে স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব নিহিত আছে তাহা ইউরোপীয় জড়বাদীদের ভ্রমাত্মক যুক্তি বলে সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসী বুঝে না যে ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্মহীনতা এ দেশে আনয়ন করিলেই আমরা ইউরোপীয় হইতে পারিব না। তাহাতে আমাদের আর্য্যজাতির বিশেষত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে কিন্তু ইউরোপীয়ের গুণ সকল আমরা লাভ করিতে পারিব না। ধর্ম্মই আর্য্যজাতির জীবন, ধর্ম্মে আস্থাই এবং ধর্ম্মাচরণই আর্য্যজাতির বিশেষত্ব; ইহা নষ্ট হইলে আমাদের পৃথিবীর কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাইবে এবং আমরা আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান ও আফ্রিকার বর্ব্বরজাতির ন্যায় ইউরোপীয়দিগের প্রভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হইব। যদিচ ইংরেজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব লোপ পাইতেছে যাহাদিগকে আমরা অশিক্ষিত মনে করি অর্থাৎ ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ লোক ও স্ত্রীলোক মধ্যে ধর্ম্মভাবের স্রোত এখনও প্রবলরূপে বহিতেছে। এই ধর্ম্মভাব আমাদের মধ্যে সজীব বলিয়া এই জাতি এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান। কত কত প্রাচীন সভ্যতা প্রাচীনকালে অভ্যুদিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে—কিন্তু আমরা মৃতপ্রায় হইলেও এখনও

জীবিত আছি আমাদের হৃদয় এখনও স্পন্দিত হইতেছে ; ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরের গুণগানে এখনও ইউরোপীয় ভাবে অশিক্ষিত ভারতবাসীর মন নাচিয়া উঠে।

ভারতবাসীর প্রধান কার্য্য—ইউরোপীয় সভ্যতার ধর্ম্ম হীনতা হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে হইবে। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন যে ইউরোপীয় সভ্যতা কেবল বাহ্যিক চাকচিক্যশালী কিন্তু অন্তঃসারবিহীন ইহা বাহ্যিক আড়ম্বর দ্বারা মানবের অভাব ও ভোগতৃষ্ণা বাড়াইয়া মানবকে একান্ত স্বার্থপর, বাহ্যসুখপ্রয়াসী, এবং তজ্জন্য নিতান্ত অসুখী করিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা যে কতদূর অনিষ্টকর তাহা গত সমগ্র-পৃথিবী-জড়িত যুদ্ধে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অতি সামান্য কারণে সেই যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠে কিন্তু ইউরোপীয় নামে-সুসভ্য জাতি মধ্যে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরস্বাপহরণ-প্রিয়তা ও অতীব স্বার্থপরতা উহার প্রকৃত কারণ। জার্ম্মাণির অভিপ্রায় কিসে পৃথিবী মধ্যে অধিকার বিস্তার দ্বারা ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রুষিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তার করিবে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অভিপ্রায় কিসে জার্ম্মাণি আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে না পারে। এই কারণে এই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া কত লোক ও কত অর্থ নাশ কত দেশ অরণ্যপ্রায় হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। ইউরোপীয় বাহ্য বিজ্ঞানের যত কিছু উচ্চ শিক্ষা কেবল মানুষ মারিবার ও দেশ অরণ্যে পর্য্যবসিত করিবার জন্য অপব্যবহৃত হইয়াছে। অধর্ম্মীর হস্তে বিজ্ঞান মানবের উপকার না করিয়া ঘোরতর পাপকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যে কিছু শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা মনে করি সে সমস্তই পরপীড়নে ও ঈশ্বরের সৃষ্টিনাশ জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল অতএব এ সভ্যতার অনুকরণ দ্বারা ইহার ঘোরতর ধর্ম্ম হীনতা ও স্বার্থপরতা এ দেশে আনয়ন করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। এরূপ বিজ্ঞান শিক্ষা অপেক্ষা অজ্ঞানতা যে অনেক ভাল তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অপর ভাবে ইউরোপীয় সভ্যতার আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় উহা মানব হৃদয়ে পাশব বৃত্তির অধিক পরিমাণে জাগরুক করিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই স্বার্থপরতা আত্মম্ভরিতা, অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখা, বিরাজ করিতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান ফল ঐ সকল জাতির প্রভূত ধনোপার্জ্জন। এই ধনোপার্জ্জন বাণিজ্য ও নানাবিধ কলকারখানা হইতে ঘটিয়াছে। এরূপ বহু ধন লাভ দ্বারা ঐ সকল দেশের বাহ্যিক চাকচিক্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে

সত্য ; অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও রাজযোগ্য প্রাসাদ ও নানাবিধ বিলাসের দ্রব্য সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে বটে ; কিন্তু তাহার দ্বারা মানবের সুখবৃদ্ধি না হইয়া কষ্টই বৃদ্ধি হইয়াছে। ধনের উপার্জ্জন অনেক হইতেছে বটে কিন্তু ঐ ধন দেশের শ্রমজীবী দিগের দ্ররিদ্রতা মোচন করে নাই। তাহারা যদিচ ঐ ধন লাভের একমাত্র সহায়, তাহারাই যদিচ স্বকীয় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঐ ধন অর্জ্জন করিতেছে তাহাদের দুর্দ্দশা মোচন হইতেছে না। ঐ ধন দেশমধ্যে প্রসারিত না হইয়া উহা কেবল জনকতক লোকের কোষ পূরণ করিতেছে ; যাহাদের দ্বারা ঐ ধন অর্জ্জিত হইল তাহারা কষ্টে উদর পূরণ করিয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেছে। ইহাতে নানারূপ কুফল ফলিতেছে। ধনীলোকগণের হৃদয়ে সর্ব্বগ্রাসিতার উদয় হইয়া, হৃদয় কঠিন ও স্বার্থপর করিয়া উহাদিগকে ঘোরতর বিলাসী করিয়া তুলিয়াছে এবং শ্রমজীবীদিগের প্রতি সহানুভূতি উহাদের হৃদয় হইতে একেবারেই লোপ পাইয়াছে। উহারা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বিবেচনা করিয়া অপর সাধারণ মানবকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। যীশুখ্রীষ্ট শিক্ষিত মানবের প্রতি ভ্রাতৃভাব উহাদের মন মধ্যে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। এইরূপ নিকৃষ্ট হৃদয় মানব স্বদেশী বা বিদেশী সাধারণ লোকের উপকার না করিয়া অপকারই করিয়া থাকে। অপরদিকে শ্রমজীবীগণ বহু শ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে তাহাদের কোন অংশ নাই দেখিয়া ধনীদিগের প্রতি একান্ত বিদ্বেষ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছে। তাহারা কতকটা নিজদোষে কতকটা ধনীদিগের সর্ব্বগ্রাসিতার জন্য নানা অভাব সহ্য করিতেছে ও বহুতর কষ্ট পাইতেছে। ধনীলোকগণ শ্রমজীবীদিগকে আত্মপদতলে রাখিবার প্রভূত চেষ্টা করিয়া তাহাতে সফলতা লাভ করিয়াছে। শ্রমজীবীগণ অল্প পারশ্রমিক লইয়া বহু পরিশ্রম করিতেছে। এইরূপ অধিক পরিশ্রম করিয়াও তাহারা স্বয়ং অথবা সন্তানগণকে অর্থাভাবে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে না এবং অজ্ঞতা বশত সে পক্ষে তাহাদের দৃষ্টি একেবারেই নাই। তাহারা যে অল্প বিশ্রামের সময় পায় তাহা পানাদি কুৎসিত আমোদে এবং বিবাদ বিসম্বাদে ক্ষেপণ করে। এইরূপে তাহাদের মধ্যে পাশববৃত্তি অতি প্রবল। প্রকৃত মনুষ্যত্ব উভয় শ্রেণীর কোন শ্রেণী মধ্যে নাই। অতএব এই ঘৃণিত সভ্যতা ও এই অসদুপায়ে অর্জ্জিত ধন লইয়া কি হইবে। যাহাতে এই ইউরোপীয় সভ্যতা দূরীভূত হইয়া মানবে প্রেম ও ভ্রাতৃভাব জগতে স্থাপিত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। এ সভ্যতা আমাদেব দেশ আক্রমণ করিয়াছে, যাহাতে ইহার বিস্তারের প্রতিরোধ হয় তাহা সকল ভারতবাসীরই একান্ত কর্ত্তব্য। কেবল এই সভ্যতা হইতে ভারত রক্ষা করিতে হইবে তাহা নহে পরন্তু সমগ্র পৃথিবী হইতে

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা দূরীকৃত করিতে হইবে নতুবা মানবের দুঃখের শান্তি হইবে না।

ইউরোপীয় জাতির অপর এক প্রধান দোষ ইহারা শ্বেতেতর জাতিকে অতীব ঘৃণা করে এবং শ্বেতেতর জাতি ইহাদের স্বার্থসাধন জন্য জন্মিয়াছে মনে করে। এইজন্য শ্বেতেতর জাতির উপর ইউরোপীয়ের অত্যাচারে পৃথিবীর ইতিহাস কলঙ্কিত রহিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার তরঙ্গ রোধ করিবার একমাত্র উপায় আমাদের প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মের বহুল প্রচার। উপনিষদ নিহিত "একমেবাদ্বিতীয়ং" মহাবাক্যের অর্থ যত মানবগণ উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে ততই স্বার্থপরতা, ধর্ম্মহীনতা, জাতি বিদ্বেষ ও শ্রেণী বিদ্বেষ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। মানব হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি যতই জাগুরুক হইবে, যতই মানব প্রত্যেক জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া জানিতে পারিবে ও প্রত্যেক জীবের অন্তরে পরমাত্মা পরমেশ্বর বিরাজমান দেখিবে ততই তাহার হৃদয় হইতে মানব প্রতি ঘৃণা ও স্বার্থপরতা অর্থলোভ এবং শ্রেণী বিদ্বেষ ও জাতি বিদ্বেষ লোপ প্রাপ্ত হইবে। পরমাত্মা জ্ঞানের প্রসারের সহিত হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া আত্মপর ভেদ ক্রমশ হ্রাস হইবে এবং মানবের প্রতি প্রেম ও জীবে দয়া মানব অন্তঃকরণে উদ্ভূত হইবে।

অতএব উপনিষদের বহুল প্রচার আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষা জানুন আর নাই জানুন সকল ভারতবাসীই যাহাতে উপনিসদের জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারেন তাহাই সকল বিশ্ব হিতৈষীর একান্ত প্রার্থনীয়। ইউরোপীয় সভ্যতার স্রোত উপনিষদরূপ বাঁধ দ্বারা রোধিতে হইবে। নতুবা ভারতবর্ষের পক্ষে এবং সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে শ্রেয়ঃ নাই। অতএব সকলে মিলিয়া উপনিষদ ও প্রাচীন শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উত্তোলন করুন এবং সেই অমৃত কেবল ভারতবর্ষে লুকাইয়া রাখিবার দ্রব্য নহে তাহা সমস্ত পৃথিবীস্থ মানবকে বিলাইতে হইবে। ইউরোপীয় যদিচ আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক দুরবস্থা জন্য এবং উহাদের আত্মম্ভরিতার দরুণ এদেশবাসীকে ঘৃণা করে তাহা হইলেও আমাদের কর্ত্তব্য আমরা ছাড়িব না। আমরা আর্য্য শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান দ্বারা ইউরোপীয় অন্ধকারময় হৃদয়ের মলা দূর করিতে চেষ্টা করিব তাহাই ভারত-সন্তানের কার্য্য সেই কার্য্যে ভারত-সন্তানের অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে।

উপনিষদের অর্থ যাহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক বুঝিতে সমর্থ হন তাহা এই সংস্করণে চেষ্টা করা হইয়াছে। আপাততঃ শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষৎ মুদ্রিত হইল।

ইহাতে মূল, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য অবলম্বনে অন্বয় ও টীকা, বাঙ্গলা প্রতিশব্দ ও বাঙ্গালানুবাদ প্রদত্ত হইল এবং ইহার দ্বিতীয় অংশে কেবল মূল ও সরল ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। পাঠকের সুবিধার জন্য ঐ ব্যাখ্যার সহিত মূল পুনর্ব্বার অর্পিত হইল। পাঠক ব্যাখ্যা মধ্যে পুনরুক্তি অনেক দেখিতে পাইবেন তাহা উপনিষদেরই অভিপ্রায় অবলম্বনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; অতএব আশা করি উহাতে পাঠক বিরক্ত হইবেন না। "একমেবাদ্বিতীয়ং" রূপ মহাবাক্যই উপনিষদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য তাহাই পুনঃ পুনঃ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি উপনিষদের এই ক্ষুদ্র সংস্করণ সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠককে উপনিষদ পাঠে প্রবৃত্ত করাইবে।

ভবিষ্যতে অপর কয়েটী উপনিষদ এইরূপে মুদ্রিত করিবার আশা রহিল।

পাটনা<br>১৭ই জানুয়ারী ১৯২২<br>মাঘ ১৩২৮

শ্রীষোড়শীচরণ মিত্র।

# ঈশোপনিষৎ।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥ ১

জগত্যাং পৃথিব্যাং ( জগতে ) যৎকিঞ্চ ( যাহা কিছু ) জগৎ গচ্ছতীতি নশ্বরং চরাচরং ( নশ্বর চরাচর বস্তু সকল আছে ) ইদং সর্ব্বং ( এই সকল ) ঈশা পরমেশ্বরেণ ( পরমেশ্বর দ্বারা ) বাস্যম্ ব্যাপ্তং ( পরমেশ্বর এই সকলে ব্যাপ্ত আছেন—তিনি এই সকলের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছেন ) তেন হেতুনা ত্যক্তেন ত্যাগেন ( অতএব বিষয়াসক্তি ত্যাগ দ্বারা ) ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথাঃ ( ভোগ কর, পালন কর ) মা গৃধঃ গৃধিং আকাঙ্ক্ষাং মা কার্ষীঃ ( ধন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিও না ) কস্যস্বিদ্ কস্যচিৎ ধনং ( ধন কাহার ? ) অথবা মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং ( কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না )।

এই বিশ্বজগতে যাহা কিছু নশ্বর চরাচর পদার্থ আছে তাহা সমস্তই পরামাত্মা দ্বারা ব্যাপ্ত, তিনি ইহার অন্তরে, ও বাহিরে বিরাজ করিতেছেন অতএব বিষয়াসক্তি ত্যাগ দ্বারা আত্মাকে ভোগ কর; আত্মজ্ঞানরূপ সুখ আস্বাদ কর। নশ্বর বিষয়াকাঙ্ক্ষা করিও না ; ধন কাহার ? অর্থাৎ কাহারও নহে।

এই শ্লোকে আত্মজ্ঞানের বিষয় বলা হইল। দ্বিতীয় শ্লোকে কর্ম্মের কথা বলা হইতেছে। যদি আত্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ হও তাহা হইলে কর্ম্ম আচরণ কর।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতংসমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২

যস্তু আত্মগ্রহণাশক্তঃ (যিনি পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত আত্মজ্ঞান লাভে অশক্ত তিনি) কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি ( অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞ প্রভৃতি অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম্ম সকল ) কুর্ব্বন্ এব (করিয়াই) শতং সমাঃ সম্বৎসরান ( শত বর্ষ ) জিজীবিষেৎ জীবিতুম্ ইচ্ছেৎ (জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিবেন) এবং এবম্প্রকারেণ ( এইরূপে ) ত্বয়ি জিজীবিষতি নরে ( তোমার পক্ষে অর্থাৎ এইরূপ কর্ম্ম করিয়া যে মনুষ্য শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকিতে চাহে তাহার পক্ষে) অন্যথা প্রকারান্তরং ( অন্য উপায় ) নাস্তি ( নাই ) যেন প্রকারেণ

( যাহার দ্বারা ) কর্ম্ম ন লিপ্যতে ( কোন কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয় অথবা কোন কর্ম্মে তুমি লিপ্ত না হও )

যিনি আত্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ তাঁহার পক্ষে উপদেশ এই যে, তিনি শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম্ম করিবার জন্য শতবর্ষ পরমায়ু আকাঙ্ক্ষা করিবেন এইরূপ দীর্ঘকালপর্য্যন্ত শুভ সকাম কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মে নিষ্কামত্ব লাভ করিবেন ইহা ভিন্ন কর্ম্মে নিষ্কামত্ব লাভের অপর উপায় নাই।

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যেকে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥

অসুর্য্যাঃ অসুরবাসযোগ্যাঃ ( অসুরদিগের বাস যোগ্য ) নাম ইতি প্রসিদ্ধাঃ অন্ধেন অদর্শনাত্মকেন ( দৃষ্টি রহিত যেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না ) তমসা অন্ধকারেণ ( অন্ধকার দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বারা ) আবৃতাঃ আচ্ছাদিতাঃ ( আবৃত ) তে ( সেই সকল ) লোকাঃ লোক্যন্তে কর্ম্মফলানি ভজ্যন্তে ইতি লোকাঃ ( যে স্থানে জীব কর্ম্মফল ভোগ করে তাহাকে লোক বলে যথা ভূলোক, ভুবর্লোক স্বর্গলোক ইত্যাদি ) যে কে ( যাহারা ) আত্মহনঃ আত্মানং ঘ্নন্তীতি ( আত্মাকে যাহারা হনন করে অর্থাৎ যাহারা আত্মজ্ঞানবিহীন অতএব প্রকৃতপক্ষে আত্মঘাতী ) তে ( তাহারা ) তান্ লোকান ( সেই লোক সকলে - সেই স্থলে ) প্রেত্য মৃত্বা ( মরণান্তে ) অভিগচ্ছন্তি ( গমন করে )।

যাহারা আত্মজ্ঞান রহিত তাহারা মৃত্যুর পর অন্ধ তমসাচ্ছন্ন অসুর লোকে গমন করে।

সেই আত্মা যাঁহার জ্ঞানের কথা উপরে বলা হইয়াছে তিনি কিরূপ তাহা নিম্নের কয়েকটী শ্লোকে বলা হইতেছে।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥

তৎ ( তিনি—শব্দ এখানে উহ্য আছে ) অনেজৎ ন এজৎ এজ্ কম্পনে কম্পনং চলনং স্বাবস্থা প্রচ্যুতিঃ তদ্বর্জিতং ( অচল অর্থাৎ সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত ) একং সর্ব্বদা একরূপং বা অদ্বিতীয়ং ( তিনি সর্ব্বদা একরূপ অথবা অদ্বিতীয় ) মনসঃ ( মন হইতে অর্থাৎ চিন্তাশক্তি হইতে ) জবীয়ঃ জববত্তরং ( অধিক বেগগামী )

দেবাঃ দ্যোতনাৎ দেবাঃ চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি (যাঁহারা আলোকিত করেন তাঁহারা দেবতা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে জ্ঞান দ্বারা আলোকিত করেন অতএব এখানে তাঁহাদের দেবতা বলা হইয়াছে এ স্থলে দেবাঃ অর্থে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল) পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বং গতং (অগ্রে গত) এনৎ (ইঁহাকে) ন আপ্নুবন্ ন প্রাপ্তবন্তঃ (চক্ষুরাদি দেবতাগণ অগ্রগামী হইয়াও ইঁহার সহিত ধাবমান হইতে পারে না) তৎ (তিনি) তিষ্ঠৎ স্থিরং (স্থিরভাবে থাকিলেও) অন্যান্ (অন্যকে অর্থাৎ মন, চক্ষু ইত্যাদিকে) অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতি (অতিক্রম করেন) তস্মিন (তাঁহাতে সেই আত্মায়) মাতরিশ্বা মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি (মাতরিশ্বা অর্থে যিনি অন্তরীক্ষে গমন করেন অর্থাৎ বায়ু) অপঃ (জল) দধাতি বিভজতি ধারয়তি বা (ধারণ করে)।

এই শ্লোকে মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু ও অপঃ অর্থে জল বুঝিতে হইবে। অথবা মাতরিশ্বা অর্থে জগতের বিধাতা হিরণ্যগর্ভ ও অপঃ অর্থে প্রাণীদিগের প্রাণধারণ প্রভৃতি ক্রিয়া ও কর্ম্মফল বুঝিতে হইবে।

তিনি অদ্বিতীয়, তিনি নিশ্চল অথচ মন হইতেও দ্রুতগামী চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ অগ্রগামী হইয়াও তাঁহার সহিত ধাবমান হইতে পারে না। তিনি স্থির থাকিয়াও ধাবমান অন্যকে অতিক্রম করেন। তিনিই বায়ু ও জলকে ধারণ করিয়া আছেন। অথবা বিশ্ববিধাতা হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। প্রাণীগণ তাঁহা হইতেই কর্ম্মে প্রেরিত হয় ও কর্ম্মফল ভোগ করে।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫॥

তৎ আত্মতত্ত্বং (তিনি—পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা) এজতি চলতি (চলেন) তৎ ন এজতি (তিনি চলেন না অর্থাৎ নিশ্চল) তৎ দূরে (তিনি দূরে অবস্থিত) তদ উ অন্তিকে সমীপে অপি (তিনি নিকটেও) তৎ সর্ব্বস্য অস্য (এই সমস্ত জগতের) অন্তঃ (অভ্যন্তরে আছেন) তৎ উ অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ (এই সমুদয় বিশ্বজগতের বাহ্য প্রদেশেও আছেন)।

তিনি সচল এবং নিশ্চল তিনি সকল পদার্থের দূরেও আছেন এবং নিকটেও আছেন। তিনি সমুদয় বিশ্বসংসারের অন্তরেও আছেন এবং বাহিরেও আছেন। প্রথম শ্লোকে যে ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং বলা হইয়াছে সেই কথাই এই শ্লোকে বিশদরূপে বুঝান হইতেছে। অর্থাৎ পরমাত্মাই সমুদয় বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনিই সর্ব্ব জগতের আধার ও আশ্রয়স্থান।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

যঃ ( যে ব্যক্তি ) সর্ব্বাণি ( সকল ) ভূতানি ( ভূতগণকে ) আত্মনি ( পরমাত্মাতে—পরমেশ্বরে ) এব অনুপশ্যতি ( দেখেন ) সর্ব্বভূতেষু ( সকল জীবে ) চ আত্মানং ( পরমেশ্বরকে ) অনুপশ্যতি ততঃ তস্মাৎ এব দর্শনাৎ ( সেই রূপ দেখার দরুণ অর্থাৎ পরমাত্মায় ও জীবে ভেদজ্ঞান না থাকায় ) ন বিজুগুপ্সতে ঘৃণাং ন করোতি ( ঘৃণা করেন না )।

যিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দেখেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

যস্মিন কালে ( যখন ) সর্ব্বাণি ভূতানি ( সর্ব্বভূত ) আত্মা এব অভূৎ পরমার্থাত্ম-দর্শনাৎ আত্মৈব সংবৃত্তঃ ( পরমার্থ দর্শনদ্বারা আত্মা বলিয়া বোধ হয় ) বিজানতঃ ( যিনি সম্যকজ্ঞাত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার ) তত্র তস্মিন কালে ( তখন ) একত্বমনুপশ্যতঃ ( একতত্ত্বদর্শী অভেদ জ্ঞানীর পক্ষে ) কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ ( মোহই বা কি শোকই বা কি ? অর্থাৎ শোক মোহ থাকে না )।

যখন সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান হয় অর্থাৎ সর্ব্বভূতই আত্মার স্বরূপ সর্ব্বভূতেই আত্মা বিরাজ করিতেছেন এইরূপ জ্ঞান হয় সেই একতত্ত্বদর্শী অভেদ জ্ঞানীর পক্ষে শোকই বা কি, মোহই বা কি ? অর্থাৎ শোক মোহ থাকে না।

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণং
অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

সঃ আত্মা ( সেই আত্মা ) পর্য্যগাৎ পরি সমন্তাৎ অগাৎ গতবান্ আকাশবদ্ব্যাপী ( আকাশের ন্যায় চতুর্দ্দিক ব্যাপী ) শুক্রং জোতিষ্মৎ দীপ্তিমান্ ( জ্যোতির্ম্ময় ) অকায়ং ( অশরীর, স্থূলদেহবিহীন ) অব্রণং অক্ষতং (স্থূলদেহ না থাকায় তিনি অক্ষত) অস্নাবিরং স্নাবাঃ শিরাঃ যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে ইতি ( শিরারহিত ) শুদ্ধং নির্ম্মলং অবিদ্যামল-রহিতং ( নির্ম্মল, অবিদ্যারূপ মল তাঁহাতে নাই ) অপাপবিদ্ধং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি

পাপবর্জ্জিতং ( পাপবর্জ্জিত—পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ) কবিঃ ক্রান্তদর্শী সর্ব্বদৃক ( সর্ব্বদ্রষ্টা ) মনীষী মনসঃ ঈষিতা ( মনের প্রভু অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ) পরিভূঃ সর্ব্বেষাং পরি উপরি ভবতীতি পরিভূঃ ( সর্ব্বোপরি বিরাজ মান অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ) স্বয়ম্ভূঃ স্বয়মেবভবতীতি ( স্বয়ং জন্মিয়াছেন ) সঃ ( তিনি ) যাথাতথ্যতঃ যথাতথাভাবঃ যাথাতথ্যং ( যাথাতথ্যরূপে—যেখানে যেরূপ উচিত সেইখানে সেইরূপ ) শাশ্বতীভ্যঃ নিত্যাভ্যঃ ( নিত্য চিরকাল) সমাভ্যঃ সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্যঃ ( সমনামক প্রজাপতিগণকে ) অর্থান্ কর্ম্মফল সাধনতঃ কর্ত্তব্যপদার্থান্ ( কর্ম্মফল সাধন জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ) ব্যদধাৎ বিহিতবান (বিহিত করিয়াছেন, দিয়াছেন)

তিনি সর্ব্বদিগ্ব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, স্থূলদেহবিহীন, স্থূলদেহবিরহিত হওয়ায় শিরা ও ক্ষত রহিত, শুদ্ধ, পাপবর্জ্জিত, তিনি স্বর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বোপরি বিরাজমান, ও স্বয়ম্ভূ ; তিনি সম্বৎসরাখ্য প্রজাপতিগণকে যথোপযুক্তরূপে কর্ত্তব্য বিধান করিতেছেন।

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯ ॥

যে ( যাহারা ) অবিদ্যাং বিদ্যায়াঃ অন্যা অবিদ্যা তাং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ অবিদ্যাং অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণাং ( অবিদ্যা অর্থে বিদ্যা হইতে অন্য অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি শাস্ত্র বিহিত সকাম কর্ম্ম ) উপাসতে তৎপরাঃ সন্তঃ অনুতিষ্ঠন্তি ( উপাসনা করে—কর্ম্মোপাসনা করে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের সকাম অনুষ্ঠান করে ) তে ( তাহারা ) অন্ধং তমঃ ( অজ্ঞানান্ধকার আত্মজ্ঞান অভাবে প্রকৃত তত্ত্ব নাজানায় আমি আমার ইত্যাদি অভিমানজনক অজ্ঞানতা ) প্রবিশন্তি ( প্রবেশ করে ) যে ( যাহারা ) উ ( পুনশ্চ ) বিদ্যায়াং কর্ম্ম হিত্বা শাস্ত্রবিহিতং কর্ম্মানুষ্ঠানং পরিত্যজ্য ( শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া কেবল দেবতাজ্ঞানে ) রতাঃ ( রত ) ( তাহারা ) ভূয়ঃ ইব বহুতরমেব ( অধিকতর ) তমঃ ( অজ্ঞানান্ধকার ) প্রবিশন্তি ( প্রবেশ করে )

যাঁহারা কেবল শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করেন আর যাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া কেবল দেবতারাধনা করেন তাঁহারা তদপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করেন।

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

অন্যৎ পৃথক্ এব ( পৃথক ) বিদ্যয়া ( বিদ্যাদ্বারা ) ক্রিয়তে ফলং ইতি আহুঃ বদন্তি ( বিদ্যাদ্বারা পৃথক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন )

অবিদ্যয়া অন্যৎ ( অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পৃথক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়— অর্থাৎ বিদ্যার ও অবিদ্যার ফল এক নহে উহা পৃথক পৃথক—একটী হইতে দেবলোক প্রাপ্তি অপরটী হইতে কেবল পিতৃলোক প্রাপ্তি ) ইতি ( ইহা ) শুশ্রুমঃ শ্রুতবন্তঃ ( শুনিয়াছি ) ধীরাণাং ধীমতাং ( জ্ঞানীদিগের নিকট হইতে ) যে ( যাঁহারা ) নঃ অস্মভ্যম্ ( আমাদিগকে ) তৎ ( কর্ম্ম দেবতাজ্ঞানং চ ) বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ ( ব্যাখ্যা করিয়াছেন )

পণ্ডিতগণ বলেন বিদ্যার ফল এক ও অবিদ্যার ফল অপর যে আচার্য্যগণ ঐ তত্ত্ব আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

যঃ ( যিনি ) বিদ্যাং দেবতাজ্ঞানং চ অবিদ্যাং ( কর্ম্ম ) চ তৎ উভয়ং সহ ( ঐ দুইটীই এক সঙ্গে অনুষ্ঠেয় ) ইতি বেদ ( জানেন ) ( তিনি ) অবিদ্যয়া ( কর্ম্ম দ্বারা ) মৃত্যুং তীর্ত্বা ( মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া ) বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানেন ( দেবতাজ্ঞান দ্বারা ) অমৃতত্ব অমরভাবত্বং ( অমরত্ব ) অশ্নুতে প্রাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন )

যিনি সকাম কর্ম্ম ও সকাম দেবোপাসনা এই উভয় এক সঙ্গে অনুষ্ঠান করেন তিনি ক্রমশঃ দুইটীর একত্র অনুষ্ঠানের ফলে অমরত্ব অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করেন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥

যে ( যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ) অসম্ভূতিং, সম্ভবনং সম্ভূতিঃ সাযস্য কার্য্যং সা সম্ভূতিঃ তস্যাঃ অন্যা অসম্ভূতিঃ অব্যাকৃতা প্রকৃতিঃ ( যাহার সম্ভূতি অর্থাৎ উৎপত্তি নাই তাহা অসম্ভূতি এই বিশ্বজগতের আধার কাম্য কর্ম্মের বীজ সমুদয় পদার্থের মূল কারণ মূলপ্রকৃতি ইহা অনাদি ও অনন্ত উৎপত্তি ও বিনাশ হীন ) তাং ( তাহাকে ) উপাসতে ( উপাসনা করে ) তে ( তাহারা ) অন্ধং তমঃ অদর্শনাত্মকং অজ্ঞানং ( অজ্ঞানান্ধকারে ) প্রবিশন্তি ( প্রবেশ করে ) যে উ ( যাহারা ও ) সম্ভূত্যাং ( উৎপত্তিশীল হিরণ্যগর্ভাদিতে ) রতাঃ ( আসক্ত অর্থাৎ উপাসনা করে ) তে ( তাহারা ) ততঃ ( তাহা হইতে ) ভূয়ঃ ইব ( অধিকতর ) তমঃ ( অন্ধকারে ) ( প্রবেশ করে )

যাহারা উৎপত্তি রহিত মূল প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে এবং যাহারা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা করে তাহারা উহা হইতে অধিকতর অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩॥

সম্ভবাৎ ( হিরণ্যগর্ভাদি উপাসনা হইতে ) অন্যৎ ( পৃথক ) এব ফলং আহু ( পণ্ডিতগণ বলেন ) অসম্ভবাৎ অব্যাকৃতাৎ অব্যাকৃতোপাসনাৎ ( প্রকৃতির উপাসনা হইতে ) অন্যৎ ( পৃথক ) ফল ইতি ( ইহা ) শুশ্রুম ( আমরা শুনিয়াছি ) ধীরাণাং ( পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ) যে ( যাঁহারা ) তৎ ( তাহা—ঐ উভয় ফল ) নঃ ( আমাদিগকে ) বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ ( ব্যাখ্যা করিয়াছেন )

যে সকল পণ্ডিতগণ আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে হিরণ্যগর্ভাদির উপসনার ফল এক ও প্রকৃতির উপাসনার ফল অন্য।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

যঃ ( যিনি ) সম্ভূতিঞ্চ অসম্ভূতিঞ্চ এখানে সম্ভূতি অর্থে অসম্ভূতি—ছন্দানুরোধে অকারের লোপ হইয়াছে ) বিনাশঞ্চ বিনাশঃ ধর্ম্মঃ যস্য কার্য্যস্য তং হি ( এস্থলে বিনাশ শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভাদি বুঝিতে হইবে—যাহার বিনাশ হয় অথবা যাহার উপাসনার ফল বিনাশ—এই শেষোক্ত অর্থই প্রশস্ত ) তৎ উভয়ং ( সেই দুইটাই ) বেদ ( জানেন অর্থাৎ উভয় উপাসনাই পুরুষের অনুষ্ঠেয় ইহা জানেন ) ( তিনি ) বিনাশেন ( বিনাশ দ্বারা—হিরণ্যগর্ভের দেবতাদিগের উপাসনা দ্বারা ) মৃত্যুং তীর্ত্বা ( মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ) সম্ভূত্যাং ( প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা ) অমৃতং ( অমরত্ব ) অশ্নুতে প্রাপ্নোতি ( প্রাপ্ত হন )

যিনি প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভের একসঙ্গে উপাসনা করেন তিনি এই উভয় অনুষ্ঠানের ফলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পরে অমৃত অর্থাৎ অমরত্ব প্রাপ্ত হন।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ ( স্বুবর্ণ পাত্রের দ্বারা অথবা জ্যোতির্ম্ময় আবরণ দ্বারা ) সত্যস্য ব্রহ্মণঃ ( পরব্রহ্মের ) মুখং দ্বারং ( ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার ) অপিহিতং ( আচ্ছাদিত ) হে পূষণ জগতঃ পোষক ( হে জগৎ পোষক হে পরমাত্মন্ ) তৎ ( সেই আবরণ ) সত্যধর্ম্মায় ( সত্যধর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্য ) দৃষ্টয়ে ( সত্যসাক্ষাৎকারের জন্য অপাবৃণু অপসারয় ( উন্মোচন করুন )

হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হে জগৎ পোষক সত্যধর্ম্ম আচরণ ও সত্যদৃষ্টির জন্য সেই আবরণ উন্মোচন করুন।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥

হে পূষন্ জগতঃ পোষণাৎ পূষা তস্য সম্বোধনে ( হে জগৎ পোষক ! ) একর্ষে এক এব ঋষতি গচ্ছতি একর্ষিঃ ( হে একাকী গমনশীল ) যম সর্ব্বস্য সংযমনাৎ যমঃ ( হে সর্ব্বসংযমকারিন্ ) হে সূর্য্য রশ্মীণাং প্রাণানাং রসানাঞ্চ স্বীকরণাৎ সূর্য্যঃ (সূর্য্য জগৎ হইতে রস ও প্রাণ গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বজগতে রস ও প্রাণ দান করেন) প্রাজাপত্য প্রজাপতেঃ অপত্যং ( হে প্রজাপতিপুত্র ) রশ্মীন্ ( সূর্য্যরশ্মী সূর্য্যতেজ ) ব্যূহ বিগময় ( সম্বরণ কর ) তেজো সমূহ একীকুরু উপসংহর ( উপসংহার কর ) তে ( তোমার ) যৎ ( যে ) কল্যাণতমং রূপং ( কল্যাণতম রূপ অত্যন্ত শোভন রূপ ) তৎ ( তাহা ) তে ( তোমার প্রসাদে ) পশ্যামি ( আমি দেখিব ) যঃ ( যিনি ) অসৌ ( এই অর্থাৎ আদিত্য মণ্ডলস্থ ) পুরুষঃ ( পুরুষ অর্থে যিনি মানবাকার অবয়ববিশিষ্ট অথবা সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া আছেন অথবা সমস্ত জগতের অন্তরাত্মা ) সোঽহমস্মি ( তিনিই আমি )

হে জগৎ পোষক ! হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য তোমার রশ্মী অপনয়ন কর এবং তেজ সম্বরণ কর যাহাতে আমি তোমার কল্যাণতম রূপ দেখিতে পাই। এই সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে পরমাত্মা তিনিই আমি।

বায়ুরনিল মমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥

অথ ইদানীং ( এক্ষণে ) মরিষ্যতঃ মম ( মৃত্যুকাল উপস্থিত আমার ) বায়ুঃ ( প্রাণবায়ু ) অনিলং সর্ব্বাত্মকং অধিদৈবতং অমৃতং প্রতিপদ্যতাং ( সর্ব্বাত্মক চিরস্থায়ী মহাবায়ুতে পরিণত হউক ) ইদং শরীরং ভস্মান্তং ভূয়াৎ ( এই শরীর অগ্নিতে আহুত হইয়া ভস্মীভূত হউক ) ওঁ ( ঈশ্বর স্মরণ করিতেছেন ) হে ক্রতো ( ক্রতু অর্থে যিনি ক্রিয়া করেন অর্থাৎ মন হে মন ) স্মর ( স্মরণ কর ) কৃতং ( নিজকর্ম্ম যাহা যাবজ্জীবন করিয়াছ তাহা স্মরণ কর ) ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ( অতিশয় প্রয়োজন বিধায় পুনরুক্তি করা হইয়াছে )

এক্ষণে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত আমার প্রাণবায়ু অমৃতময় মহাবায়ুতে মিশ্রিত হউক। আমার দেহ অগ্নিতে আহুতিস্বরূপ হইয়া ভস্মীভূত হউক। ওঁ ব্রহ্ম ! হে মন নিজ কৃতকার্য্য ও কর্ত্তব্য স্মরণ কর, স্মরণ কর, স্মরণ কর।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

হে অগ্নে অস্মান্ ( আমাদিগকে ) রায়ে ধনায় কর্ম্মফল ভোগায় ( কর্ম্মফল ভোগ জন্য ) সুপথা সুমার্গেন ( সুপথ দ্বারা ) নয় গময় ( লইয়া যাও ) হে দেব [ ত্বং ] বিশ্বানি সর্ব্বাণি বয়ুনানি কর্ম্মাণি জ্ঞানানি বা ( কর্ম্ম অথবা জ্ঞান ) বিদ্বান্ জানন্ ( জ্ঞাত আছ ) অস্মৎ ( আমাদিগের হইতে ) জুহুরাণং কুটিলং বঞ্চনাত্মকং ( প্রবঞ্চনাকারী ) এনঃ পাপং ( পাপ ) যুযোধি বিয়োজয় ( যুদ্ধকর বিনাশকর ) ততঃ বয়ং বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ ইষ্টং প্রাপ্স্যামঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। হে তুভ্যং ( তোমাকে ) ভূয়িষ্টাং বহুতরাং ( বহু বহু ভূরিভূরি ) নমঃ উক্তিং ( নমস্কার বচনং ) বিধেম পরিচরেম ( নমস্কার দ্বারা তোমাকে প্রসাদিত করিব )

হে অগ্নি কর্ম্মফল ভোগ জন্য আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও ; হে দেব তুমি সমুদয় কর্ম্ম ও জ্ঞান জ্ঞাত আছে ; আমাদিগের মন মধ্যে যে প্রবঞ্চনাত্মক পাপ আছে তাহা বিনাশ কর। আমরা ভূরি ভূরি তোমার স্তুতি করিতেছি।

ওঁ পূর্ণ মদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ ( ওঙ্কার স্মরণ করিয়া ) পূর্ণং অদঃ ( উহা ) পূর্ণ মিদং ( ইহা এই সমগ্র বিশ্ব ) পূর্ণাৎ ( পূর্ণ হইতে ) পূর্ণং উদচ্যতে ( উদ্গত হয় ) পূর্ণস্য ( পূর্ণের ) পূর্ণং আদায় ( লইলে ) পূর্ণং এব ( পূর্ণ ই ) অবশিষ্যতে ( অবশিষ্ট থাকে )

ওঁ যাঁহাকে উহা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তিনি পূর্ণ অর্থাৎ পরব্রহ্ম পূর্ণ ; যাহাকে ইহা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় অর্থাৎ এই সমগ্র বিশ্ব তাহাও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে বিশ্ব উদ্গত হয় এবং পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ইতি ঈশোপনিষদ্ সমাপ্ত

# উপনিষদের

# সরল ব্যাখ্যা ।

## ( ঈশা )

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ ইহা কি তাহাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ এই যে,—এই বিশ্বজগতে যাহা কিছু নশ্বর চরাচর পদার্থ আছে তাহা সকলই পরমাত্মা পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত, সকলের অভ্যন্তরে ও বাহিরে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন।

জগৎ শব্দের অর্থ ।

গচ্ছতীতি জগৎ। গম ধাতুর অর্থ গমন করা, যাহা গমন করে তাহাই জগৎ; যাহা থাকে না, যাহা স্থায়ী নহে, যাহা অনিত্য, তাহাই জগৎ। এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যখন নামকরণ হইয়াছিল, যখন ইহাকে প্রথম জগৎ নামে অভিহিত করা হয় তখনই আমাদের ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণ ইহার প্রধান গুণের বিষয় অবগত ছিলেন, ইহা অস্থায়ী ইহা নশ্বর। এই শ্লোকার্দ্ধে জগত শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম—জগত্যাং শব্দের অর্থ জগতে—এই স্থলে এই শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় জগৎ শব্দটীর এই স্থলে অর্থ নশ্বর। অর্থাৎ জগতের প্রধান গুণ নশ্বরতা তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে। যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—ইহার অর্থ, বিশ্বসংসারে যাহা কিছু নশ্বর পদার্থ আছে।

সূর্য্য ।

এক্ষণে বিশ্ব বা জগৎ কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমরা প্রতিদিন প্রাতে পূর্ব্বদিকে নভোমণ্ডলে সুবর্ণময় গোলাকার যে পদার্থ দেখি এবং যাহা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয় তাহার নাম প্রাচীন ঋষিগণ সূর্য্য দিয়াছেন। সূর্য্য অর্থে প্রসবিতা যিনি প্রসব করিয়াছেন, তিনি এই সৌর জগৎ প্রসব করিয়াছেন। এই সূর্য্য একটী প্রকাণ্ড গোলাকার অগ্নিময় আলোকময় তেজোময় পদার্থ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন

যে ইহা পৃথিবী হইতে ৯,২৭,০০,০০০ নয় কোটী সাতাইশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত; ইহার আকার পৃথিবী অপেক্ষা ১৩,৩১,০০০ তের লক্ষ একত্রিশ সহস্র গুণ বড় এবং ওজনে পৃথিবী অপেক্ষা ৩,৩৩,০০০ তিন লক্ষ তেত্রিশ সহস্র গুণ বেশী। কিরূপে সূর্য্যের পৃথিবী হইতে দূরত্ব, ইহার আকার ও ওজন স্থির হইল ও তাহা কতদূর প্রকৃত ইহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। যাঁহারা সে বিষয়ে আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে হইবে। আমরা সে আলোচনা করিতে অসমর্থ; অতএব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।

এই প্রকাণ্ড তেজোময় আলোকময় ও অগ্নিময় পদার্থের চতুর্দ্দিকে অপর কতকগুলি জড়পিণ্ড অনবরত ঘুরিতেছে; তাহাদিগকে গ্রহ বলে। তন্মধ্যে পৃথিবী একটী; অপর গ্রহগুলির নাম, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি। আমরা বাহ্যতঃ দেখিতে পাই যে সূর্য্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন, অতএব অশিক্ষিত লোক মাত্রেই মনে করে যে পৃথিবী একস্থানে অবস্থিত ও সূর্য্য দিনমানে তাহার পূর্ব্বভাগ হইতে পশ্চিমে গমন করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবপক্ষে সূর্য্যকে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষ অবলম্বনে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই সকল গ্রহের সহিত কতকগুলি উপগ্রহ আছে তাহারা এক একটী গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে যেমন, চন্দ্র আমাদের পৃথিবী গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিতেছে অতএব চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকাণ্ড অথবা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পদার্থ অন্তরীক্ষে সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, ইহাদের কেন্দ্র সূর্য্য। সূর্য্য ও তাহার অবলম্বনে যে সকল গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি আকাশে ভ্রমণ করিতেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই অংশকে সৌরজগৎ নামে অভিহিত করা হয়। ইহা বিশ্বের বা জগতের একটী অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

সৌরজগৎ।

রাত্রিকালে আকাশে নেত্রপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, অসংখ্য তারকাগণ সমুদয় আকাশের সহিত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল প্রতি রাত্র ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক ঐ নক্ষত্র সকল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ভ্রমণ করিতেছে না, আমাদের পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে। যে কারণে সূর্য্য ভ্রমণ করিতেছে ও পৃথিবী স্থির আছে বলিয়া বোধ হয় সেই কারণেই নক্ষত্র সকল নভোমণ্ডলের সহিত রাত্রিকালে একদিক হইতে অপর দিকে গমন করিতেছে বলিয়া

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ আমাদের পক্ষে এক স্থানে উহারা অবস্থিত আছে বলিলে বিশেষ ভুল হয় না। ঐ সকল নক্ষত্র মধ্যে ছয় সাতটী ব্যতীত সবগুলিই এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্য-প্রায় ও এক একটী সৌরজগৎ তুল্য নাক্ষত্রিক জগতের কেন্দ্র। আমাদের সূর্য্য যেমন প্রকাণ্ডাকার, অগ্নিময় ও আলোকময় ঐ নক্ষত্রগুলিও সেইরূপ বৃহদায়তন বিশিষ্ট এবং ঐরূপ তাপ ও আলোক বিকীরণ করিতেছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি আমাদের সূর্য্য অপেক্ষাও বহুগুণ বৃহদাকার; আমাদের সূর্য্যের যেরূপ গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি আছে উহাদের প্রত্যেকেরও ঐরূপ গ্রহ উপগ্রহ আছে এবং ঐ সকল গ্রহ উপগ্রহ তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। অতএব আমাদের সৌরজগতের ন্যায় লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী অপর সৌরজগৎ বা নাক্ষত্রিক জগৎ এই বিশ্বে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ নক্ষত্র সকল বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া আমরা উহাদিগকে অত ক্ষুদ্র দেখি; অধিক সংখ্যক নক্ষত্র এতই ক্ষুদ্র যে, আমরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিনা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না এবং অনেকগুলি এরূপ আছে যাহাদিগকে দূরবীক্ষণের সাহায্যেও আমরা দেখিতে পাই না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সূর্য্য ও নক্ষত্র-গুলি নিশ্চল অর্থাৎ পৃথিবীর হিসাবে তাহারা এক স্থানে অবস্থিত মনে করিলে বিশেষ ভ্রম হয় না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের সূর্য্য নিজ গ্রহ উপগ্রহগণ লইয়া বিমান পথে একদিকে অতি দ্রুতভাবে চলিতেছেন এবং সেইরূপ প্রত্যেক নক্ষত্রও নিজ নাক্ষত্রিক গ্রহ উপগ্রহ লইয়া আকাশ পথে দ্রুতভাবে ভ্রমণ করিতেছে। আমাদের সৌরজগৎও এই অসংখ্য কোটী কোটী নাক্ষত্রিক জগৎ একত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উপরে আমরা ছয় সাতটী নক্ষত্রের কথা বলিয়াছি যাহারা অপর নক্ষত্রের তুল্য নহে; তাহারা আমাদের এই সৌরজগতের গ্রহ, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি; ইহাদের নিজের আলোক নাই উহারা সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়া আমাদের চক্ষে নক্ষত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু উহারা নক্ষত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায় যে উহারা পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

আমরা উপরে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিবরণ দিলাম তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া। উপনিষদের আলোচনায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টির জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া পাশ্চাত্য শাস্ত্রে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যাহা বিবৃত আছে তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ বিবরণ অতি সংক্ষেপে আমরা এস্থলে দিলাম। শিক্ষিত পাঠকের

পক্ষে এসকল পুরাতন কথা কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়েরই জন্য অতএব শিক্ষিত পাঠক এই সকল জ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ জন্য ক্ষমা করিবেন।

আমরা পূর্ব্বেই ভূমিকাতে বলিয়াছি যে উপনিষদ যে শিক্ষা দিতেছে তাহা ধ্যানগম্য। উপনিষদ ঈশ্বর জ্ঞান দান করে। এই জ্ঞান তর্কে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ইহা কেবল উপদেশ দ্বারা লাভ করা যায় না। এই জ্ঞান লাভ করিতে উপদেশ ও ধ্যান উভয়ই আবশ্যক। উপনিষদ শাস্ত্রে ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে দেওয়া আছে; এক একটী উপদেশ এক একটী শ্লোকে বা শ্লোকার্দ্ধে অথবা শ্লোকের চতুর্থাংশে নিহিত আছে; এই শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোক-চতুর্থাংশকে মন্ত্র বলা যায় এই মন্ত্র ক্রমাগত ধ্যান করিতে হইবে, এই ধ্যান করিতে করিতে ইহার অর্থের সম্যক উপলব্ধি হইবে; একটী উপদেশ হইতে অপর উপদেশ স্বতঃই আপন মনে উদয় হইবে। প্রাচ্য ধর্ম্মজ্ঞান এইরূপে লাভ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত পরীক্ষণ অবেক্ষণ বিচার ও তর্ক প্রভৃতি যে সকল উপায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে ফলদায়ক হয় তাহা ও কতক পরিমাণে প্রয়োজন। আমাদের মন ঈশ্বরের অংশ, ইহাতে সকল জ্ঞান নিহিত আছে। মন কেবল জ্ঞান ভুলিয়া বাহ্য বস্তু লইয়া বিব্রত; মনকে বহির্ম্মুখী আসক্তি ত্যাগ করাইয়া তাহাকে ধ্যান দ্বারা অন্তর্মুখ করাইতে পারিলে ঈশ্বর জ্ঞান লাভ হয়। বহির্দ্দেশে আমাদের মন নানাদিকে ধাবিত কোন দিকেই সবিশেষ মনঃ সংযোগ করিতে পারে না উহাকে বাহ্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরে একীকৃত করিয়া একটী বিষয়ে সংযোগ করিতে পারাই ধ্যান। এই ধ্যান দ্বারা অন্তর্নিহিত জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। সকল জ্ঞানের জন্যই মনঃসংযোগ আবশ্যক; ঈশ্বর জ্ঞান লাভের জন্য উহা অধিকতর প্রয়োজনীয়, উহা না হইলে ঈশ্বর জ্ঞান হইবে না। ঈশ্বর সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন ইহা ধ্যান করিতে গেলে আগে বিশ্বের ধ্যান আবশ্যক।

ধ্যানের আবশ্যকতা।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ধ্যান কিরূপে করিতে হইবে তাহার কোন এক প্রশস্ত পথ নাই। বিভিন্ন লোক স্বকীয় প্রকৃতি ও জ্ঞানানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিবেন, তবে মোটামুটি দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। মনে করুন আপনি আপনার কলিকাতাস্থ বা অপর কোন নগরীস্থ অথবা গ্রামস্থ বাটীতে বসিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধ্যান করিতেছেন। আপনি সার্দ্ধ তিন হস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র মানব, দেড় বর্গ হস্ত পরিমিত আসনে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, দেখুন আপনি কত সামান্য স্থান

অধিকার করিয়া আছেন, সে তুলনায় আপনার বাটী অনেক বৃহৎ তাহাতে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা প্রভৃতি অনেকে বাস করিতেছে; আপনার বাটীর তুলনায় আপনার গ্রাম কত বড়, গ্রামের তুলনায় আপনার জেলা, জেলার তুলনায় বাঙ্গালা দেশ কত বৃহৎ ইহাতে কত গ্রাম নগর নগরী, কত নদ নদী কত মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি আছে এই বাঙ্গালা দেশ হইতে ভারতবর্ষ কত বিস্তৃত ইহাতে ৩৩ কোটী মানব বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকে নানারূপ আকাঙ্ক্ষায় নানা পথে বিচরণ করিতেছে, এইরূপ ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে সৌর জগৎ ও তৎপরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিন্তা করিতে হইবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আয়তন ধ্যান করিতে হইবে। আর এক ভাবে দেখুন। প্রথমতঃ এই মানব দেহের চিন্তা করুন; ইহা একটী অত্যদ্ভুত যন্ত্র; ইহা মাংস, মেদ, অস্থি, শিরা প্রভৃতিতে অতি সুচারুরূপে গঠিত; আমাদের বিনা চেষ্টায় এমন কি আমাদের অজ্ঞাতসারে কিরূপ সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের শরীর-ক্রিয়া সাধিত হইতেছে; শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুকৌশলে সম্পাদন করিতেছে; চক্ষু দেখিতেছে, কর্ণ শ্রবণ করিতেছে, নাসিকা আঘ্রাণ লইতেছে, জিহ্বা আস্বাদ লইতেছে; ইহারা এই সকল কার্য্য না করিলে আমাদের জীবন অতি কষ্টকর হইত এমন কি প্রাণনাশও হইতে পারিত। এইগুলি হইল বাহ্যেন্দ্রিয় মানব দেহের কতকগুলি যন্ত্র এরূপ আছে যাহা না থাকিলেও মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে কিন্তু অপর কতকগুলি যন্ত্র আছে যথা—হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, পাকস্থলী, যাহা না থাকিলে মানব প্রাণধারণ করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন মানব শরীরে সহস্র সহস্র শিরা আছে যাহাতে অনবরত রক্ত চলাচল করিতেছে। ইহাদের কার্য্য প্রণালী অতি বিস্ময়কর সে বিষয়ের আলোচনা এস্থলে অসম্ভব, যিনি এ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তাঁহাকে পাশ্চাত্য শরীর বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আবার অতি সহজেই এই মানব দেহ বিনষ্ট হয়। এই দেহের কার্য্য যেরূপ আমাদের বিনা চেষ্টায় বা অজ্ঞাতসারে চলিতেছে। সেইরূপ এই পৃথিবীর কার্য্য ও এই জগতের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে; পৃথিবী একরূপেই সূর্য্যকে পরিক্রম করিতেছে; সূর্য্য আলোক ও তাপ দিতেছেন; সময়ে বৃষ্টি দিয়া বৃক্ষাদি ও শষ্যাদি উৎপন্ন ও বৰ্দ্ধন করিতেছেন।

আবার আর একভাবে এই বিশ্বের ধ্যান করুন:—আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র দেহই কত কত বিভিন্ন রূপধারী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির সমষ্টি; আমার মত কত কোটী কোটী মানব এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে—কিন্তু

তাহাদের প্রত্যেকের মূর্ত্তি অপরের মূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন ; একজনের সহিত অপরের এরূপ পার্থক্য আছে যাহাতে উভয়কে বিনা আয়াসে চিনিতে পারা যায়। এইরূপ পশুপক্ষী প্রভৃতি কত কোটী কোটী রূপ বিভিন্ন আকারের জীবজন্তু আছে ; কত বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ ; কত প্রস্তর মৃত্তিকাদি জড়পদার্থ অসংখ্য নব নব রূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীতে যেরূপ নানা জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী ও পদার্থ আছে সেইরূপ অপরাপর গ্রহগুলিতেও অন্যবিধ অসংখ্য জীব কতরূপ দেহ ধারণ করিয়া স্বস্ব কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। ইহা আলোচনা করিলে মস্তিষ্ক আলোড়িত ও হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হয়।

অপর এক ভাবে দেখুন। ক্ষুদ্র মানব দেহ কত স্বল্পস্থায়ী ; কেহ জন্মমাত্রেই মরিতেছে ; কেহ অল্পাধিক সময় জীবন ধারণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে ; কিন্তু যিনি যতই দীর্ঘজীবী হউন না কেন ১০০ বা ১২০ বৎসরের অধিক বাঁচেন না। চিন্তা করুন একজন বাঙ্গালীর জীবন সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জীবনের তুলনায় কত ক্ষুদ্র ; বাঙ্গালীর পর বাঙ্গালী মরিতেছে কিন্তু বাঙ্গালী জাতি সহস্রাধিক বর্ষ জীবিত আছে এবং ভবিষ্যতে কত বর্ষ জীবিত থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে। এইরূপ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জীবনী মানবজাতির জীবনীর তুলনায় কত ক্ষুদ্র এবং মানবজাতির জীবন পৃথিবীর জীবনের তুলনায় কত স্বল্পস্থায়ী। আবার পৃথিবী সৌরজগৎ সৃষ্টির কত পরে সৃষ্ট হইয়াছে এবং সৌরজগৎ অপরাপর নাক্ষত্রিক জগতের তুলনায় এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় কত স্বল্পস্থায়ী তাহা কে বলিতে পারে ?

এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে আমরা জগতের আয়তন, বিবিধত্ব ও অস্থায়িত্ব, সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিব। ইহার সম্যক উপলব্ধি মানবের ক্ষমতাতীত, মানব অতি ক্ষুদ্রমতি ; মানবের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে অসীম জগতের অসীম গুণের সম্পূর্ণ জ্ঞান অসম্ভব। অতএব আপাততঃ ধ্যান দ্বারা এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

জগৎ নশ্বর।

যদিচ এই জগৎ এত বৃহৎ, এত দীর্ঘকালস্থায়ী ও অসংখ্যরূপ দ্রব্যে পরিপূর্ণ ইহা নশ্বর ও অনিত্য ; ইহা চিরস্থায়ী নহে। ইহার আদি আছে অন্ত ও আছে। সত্য বটে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী মানব, জগতের আদি দেখিনাই এবং অন্ত ও দেখিতে পাইব না ; কারণ আমরা জগৎ হইতে পৃথক নহি জগতের অংশ। জগৎ যখন ছিল না আমরাও ছিলাম না ; জগৎ যখন থাকিবে না আমরাও থাকিব না ; সুতরাং আমরা কিরূপে

উহার আদি বা অন্ত দেখিতে পাইব ? জগতের মধ্যাবস্থায়, জগৎ সৃষ্টির বহুপরে— পৃথিবীর সৃষ্টি ও পৃথিবী সৃষ্টির বহুপরে, মানবের সৃষ্টি এবং জগৎ অন্তের বহুপূর্ব্বে বর্ত্তমান পৃথিবীর লয় হইবে এবং অপর কত কত পৃথিবী সৃষ্ট হইবে তাহা কে বলিতে পারে। অতএব আমরা ক্ষুদ্র-শরীরী, অল্পমতি, ক্ষণজীবী মানব কিরূপে জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিব। আমরা এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহা প্রাচ্যঋষিগণের ধ্যান সম্ভূত অনুভব ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-গণের যুক্তিপূর্ণ অনুমান দ্বারা। এক্ষণে এই উভয় মার্গ অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে জগৎজ্ঞান ও ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। কিন্তু এ স্থলে আমরা জগৎ সৃষ্টির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব না, উপনিষদ আলোচনা করিতে করিতে আমরা যথাস্থানে ঐ বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইব। এক্ষণে জগতের নশ্বরতা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

আমরা যেদিকেই দৃষ্টিপাত করিনা কেন' সর্ব্বদিকেই জগতের নশ্বরতার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। এই মানব দেহ নশ্বর ইহা অদ্য আছে কল্য হয়ত থাকিবে না। আজ যে মনুষ্য ধনজন যৌবন গর্ব্বে মত্ত হইয়া আপনার ক্ষমতা অপরের উপর বিস্তারিত করিয়া অপরকে উৎপীড়ন করিতেছে, তাহাদের ধন অপহরণ করিয়া আপনার অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিতেছে, কাল সেই লোক শমন কবলে পতিত হইতেছে তাহার অসদর্জ্জিত ধন অপরের করতলগত হইতেছে। আজ যে রাজ-প্রাসাদ আকাশ মার্গে আপনার দেহ উত্তোলন করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ অট্টালিকাকে উপহাস করিতেছে কল্য সেই অট্টালিকা কামানের গোলায় ভস্মীভূত অথবা কালস্রোতে ভগ্নীভূত হইবে। ভূতত্ত্ব আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে পৃথিবীর উপরিভাগেব ও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও অনবরত হইতেছে। এই যে বিস্তৃত বঙ্গদেশ, ইহার এক সময়ে অস্তিত্ব ছিল না ; এই স্থলে অতলসাগর বিদ্যমান ছিল। যেখানে এক্ষণে অসংখ্য তড়িৎযান, বাষ্পযান ও অশ্বযান প্রভৃতি অনবরত ধাবিত হইতেছে সেস্থল অপার সাগর তরঙ্গের লীলাস্থান ছিল। পৃথিবীর অনেক স্থলে এক সময়ে নগর গ্রাম অবস্থিত ছিল ও কত কত মণীষী তথায় মানব জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন সে সবস্থল এক্ষণে সাগর গর্ভে পতিত হইয়াছে। যে স্থলে এক্ষণে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত হিমালয় নিজ ধবল শিখর উচ্চে উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান সে স্থলে এক সময়ে সমুদ্রগর্ভ ছিল। এইরূপে পৃথিবীর উপরিভাগস্থ পরিবর্ত্তন অনবরত ঘটিতেছে ও ঘটিবে। সেইরূপ আবার এই পৃথিবী ও অনিত্য ইহা আদিতে ছিল না এবং পরেও চিরকাল থাকিবে না। এই যে গ্রহ সকল

যাহা পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে স্ব স্ব কক্ষ অবলম্বনে ভ্রমণ করিতেছে এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ আয়তনে পৃথিবীর অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ, এই সকল গ্রহগণও চিরস্থায়ী নহে, এগুলিও এক এক সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে এবং পরে বিলুপ্ত হইবে। এই যে সৌরজগতের কেন্দ্রস্বরূপ সূর্য্যদেব যিনি এই সৌরজগৎ প্রসব করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে সমগ্র সৌরজগৎ আপনাতে লয় করিবেন ইনিও চিরস্থায়ী নহেন। ইঁহারও জন্ম ও মৃত্যু আছে; ইঁহারও আদি ও অন্ত আছে। সেইরূপ আবার সমস্ত নাক্ষত্রিক জগৎ ও আদি ও অন্তবান। অতএব সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই নশ্বর ও অস্থায়ী।

বিশ্বের নশ্বরতা দ্বিবিধ:—এক, ক্রমিক পরিবর্ত্তন; দ্বিতীয় কল্পান্তকলোপ। এই নশ্বর জগতে কোন পদার্থই স্থায়ী নহে; কোন পদার্থ কোন জীবজন্তু চিরকাল বা কোনকাল একভাবে থাকে না। সমুদয় দ্রব্য ও জীবই পরিবর্ত্তনশীল; সকলই অনবরত এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থাতে নীত হইতেছে। এই মানব

নশ্বরতা দ্বিবিধ।
(১) ক্রমিক রূপান্তর

শরীর দুই মুহূর্ত্তেও একরূপ থাকে না কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; সুস্থকায় শিশুর দেহ অনবরত বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতেছে; বৃদ্ধের দেহ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতেছে; যুবার দেহ কখন পুষ্ট কখন ক্ষীণ হইতেছে। ঐরূপ বৃক্ষাদি উদ্ভিদ পদার্থ প্রতি মুহূর্ত্তে বর্দ্ধিত হইতেছে অথবা উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শুষ্ক হইতেছে এবং ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। প্রস্তরাদি সকল দ্রব্যই ঐরূপ, কখন একভাবে থাকে না; সূর্য্যের তাপ ও আলোকে এবং বায়ুর দ্বারা ঐ সমুদয় পদার্থের রাসায়নিক অথবা কেবল বাহ্যিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অতএব এই নামরূপময় জগতের নামরূপ ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনই জগতের স্বভাব। অনবরত একটী রূপ বিনষ্ট হইয়া অপর রূপ গঠিত হইতেছে। বাস্তব পক্ষে দেখিলে এই প্রক্রিয়ার নাম বিনাশ দেওয়া যায় না—ইহা সৃষ্টির একটী প্রকরণ; পদার্থ একরূপ ত্যাগ করিয়া অপররূপ ধারণ করিতেছে অথবা একরূপ পদার্থ স্বীয় কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়া অপর কলেবর ধারণ করিতেছে। যেমন অদ্য যে দীর্ঘাকার বৃক্ষ আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে, এবং ফলপুষ্প ছায়া দ্বারা মানবজাতি এবং পশু পক্ষীর বহুতর হিতসাধন করিতেছে কল্য হয়ত সেই বৃক্ষ ঝড়ে, অথবা কালক্রমে শুষ্ক হইয়া, ভূমিতলে পতিত হইয়া মৃত্তিকাকার ধারণ করিতেছে কিম্বা অগ্নি সংযোগে অঙ্গারে ও বাষ্পে পরিণত হইতেছে। অদ্য যে মানবদেহ সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে

এবং নানাবিধ পুণ্য অথবা পাপকার্য্যের আচরণ করিতেছে, কল্য সেই দেহ মৃত্যুকরতলগত হওনান্তর অগ্নি দগ্ধ হইয়া অঙ্গার, জল ও বায়বীয় পদার্থে পরিণত হইতেছে অথবা কবরস্থ হইয়া মৃত্তিকা জল ও বায়বীয় পদার্থের রূপ ধারণ করিতেছে। ইহাকে প্রকৃত পক্ষে বিনাশ বলা যায় না ইহা সাধারণ পরিবর্ত্তন মাত্র। যদি চ আমাদের চক্ষে আপততঃ ইহা বোধ হয় যে ঐ দ্রব্যের বিনাশ হইল তাহা নহে প্রকৃত পক্ষে জগতে অনবরত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে কিন্তু কোন পদার্থেরই বিনাশ নাই। সকল পদার্থই একভাব ছাড়িয়া অপর ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত হইয়া অগ্নিসংযোগে তাহা দগ্ধ করিয়া তাহাকে নূতন আকার ধারণ করাইলাম; যে ব্যক্তি ঘট কি দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হইয়াছে জানে না সে ঘটের মধ্যে মৃত্তিকা দেখিতে পায় না; পরে আবার ঐ ঘট ভগ্ন হওয়ায় আমরা উহা ফেলিয়া দিই এবং উহা ভূমিতলে পড়িয়া ক্রমে পদাঘাত বা অপর কঠিন দ্রব্যের আঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া ক্রমশঃ পুনরায় মৃত্তিকাতে পরিণত হয়; পুনশ্চ মৃত্তিকা হইতে জল সংযোগে হয়ত কোন বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পরে কাষ্ঠে পরিণত হয়, কিন্তু কোন অংশ ধ্বংস হয় না। সকল দ্রব্যই পঞ্চ মহাভূতাত্মক এবং প্রত্যেক দ্রব্যেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি এক মহাভূত হইতে অপর মহাভূতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা কেবল রূপান্তর মাত্র, উহার দ্বারা নামরূপের পরিবর্ত্তন হয়, পদার্থের বিনাশ হয় না। ইহাকে ক্রমিক রূপান্তর বলা যাইতে পারে।

অপরবিধ নাশকে আমরা কল্পান্তক লোপ নামে অভিহিত করিয়াছি। এই যে বিশাল জগৎ, ইহা আদিতে ছিল না এবং অন্তেও থাকিবে না। আদিতে কেবল সেই একমাত্র অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মা ছিলেন এবং অন্তেও তিনি এক থাকিবেন, মধ্যে এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া কিয়ৎকাল তাঁহাতেই অবস্থিত থাকে এবং পরে সময় আগত হইলে তাঁহার ইচ্ছাতেই তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা পরমেশ্বরই ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া রক্ষা করেন এবং মহেশ্বররূপে নামরূপময় জগতের লয় করেন। এই সৃষ্টি ও স্থিতিকালকে শাস্ত্রে ব্রহ্মার দিন বলে এবং প্রলয় কালকে ব্রহ্মার রাত্রি বলে। দিবার প্রারম্ভে ব্রহ্মা মহানিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করেন এবং সমগ্র দিবাভাগে সৃষ্টি ও স্থিতির কার্য্য হইয়া দিবাবসানে প্রলয় আরম্ভ হয়; এই প্রলয়কাল ব্রহ্মার রাত্রি তিনি এই সময়ে সৃষ্টি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া বিশ্রাম করেন। এই দিবাকে

কল্পান্তক লোপ।

এক কল্প বলে ; এইরূপে কল্পের পর কল্প আসিতেছে ও যাইতেছে ; প্রত্যেক কল্পে কত কত জগৎ সৃষ্ট হইয়া কল্পান্তে ঈশ্বরে বিলীন হইতেছে। এইরূপে কত কত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়া পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে পুনরায় সৃষ্ট ও লয় প্রাপ্ত হইবে। ইহাই কল্পান্তক লোপ।

অতএব আমরা ইহা শিক্ষা করিলাম যে জগৎ নশ্বর। ইহা অনিত্য ; ইহা চিরস্থায়ী নহে। ইহার কোন অংশ কখন একভাবে থাকে না ; ইহা অনবরত রূপান্তরিত হইতেছে এবং অবশেষে কল্পান্তে ব্রহ্মার রাত্র্যাগমে একেবারে পরমাত্মা পরমেশ্বরে লীন হইবে। পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টির আরম্ভে ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়া অনবরত রূপান্তরিত হইয়া অবশেষে পরমেশ্বরেই লয় প্রাপ্ত হইবে।

এক্ষণে আমাদের ঈশা বাস্যং শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। এই নশ্বর জগতে যে কিছু পদার্থ আছে তৎসমুদয়ই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত। পরমাত্মা পরমেশ্বর সকল

ঈশা বাস্যং।

পদার্থকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি সকল পদার্থেরই অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই সকল পদার্থ। তিনি বিশ্ব সংসারের মূল ও আধার। সমস্ত জগতই তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ও তাঁহাতেই লীন হইবে ; সেইরূপ জগতের স্থিতি কালে তাঁহাতেই অবস্থিতি করে। জগৎ তাঁহারই দেহ। তিনিই জগদাকার ধারণ করিয়া বিশ্বলীলা করিয়া থাকেন এবং লীলাবসানে প্রলয় কালে সেই দেহ সম্বরণ করেন। সমুদ্র তরঙ্গ যেরূপ সমুদ্র দেহ হইতে উত্থিত হওনান্তর নানাবিধ আকার ধারণ পূর্ব্বক বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত কলেবরে কিয়ৎক্ষণ দ্রুতবেগে ধাবিত হয় এবং পরক্ষণই সমুদ্র মধ্যে মিশাইয়া যায়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ। সমুদ্র তরঙ্গ যে আকারই ধারণ করুক না কেন এবং যে বর্ণেই শোভিত হউক না কেন, উহা সমুদ্র জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ তরঙ্গ সমুদ্র-জল ব্যাপ্ত, সমুদ্র-জলময়। উহার যে অংশ উঠাইয়া দেখ না কেন, দেখিবে উহাতে সেই লবণাক্ত স্বচ্ছ জল আছে ; উহার ভিন্ন ভিন্ন আকার, পৃথক পৃথক বর্ণ, অতি ক্ষণস্থায়ী তাহা উহার নিত্য অংশ নহে, উহার ক্ষণস্থায়ী মূর্ত্তি ; কিন্তু লবণাক্ত স্বচ্ছ জলই উহার অপেক্ষাকৃত নিত্য পদার্থ। ঐ পদার্থই তরঙ্গের আধার ; তরঙ্গ বলিলে যে দ্রব্য ও যে রূপ আমাদের অন্তরে উদিত হয় ; অথবা সমুদ্রতীরে দাঁড়াইলে তরঙ্গ নামধেয় যে দ্রব্য আমরা দেখি তাহা জল দ্বারা ব্যাপ্ত ; উহা আর কিছুই নহে ঐ জলই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। অপর একটী উদাহরণ দেখা যাউক। স্বর্ণ হইতে আমরা অনেকরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকি। বালা, হার, বাজু,

তাবিজ প্রভৃতি স্ত্রীলোক বা বালক বালিকার অলঙ্কার, ঘড়ি ও ঘড়ির চেন ও চসমার ডাঁটি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য, এ সকলই সুবর্ণ হইতে প্রস্তুত হইয়া নানা আকারে আমাদিগের দেহের শোভা বর্দ্ধন অথবা প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করিতেছে। এই সকল দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পৃথক পৃথক রূপ। বালা বলিলে আমাদের মনে একরূপ মূর্ত্তির উদয় হয় ও চেন বলিলে অপর মূর্ত্তির উদয় হয় আবার বালাও কতরূপ আছে এবং চেনও কতরূপ আছে। কিন্তু সকল বালা, সকল চেন ও সকল সুবর্ণময় অলঙ্কারই সুবর্ণ দ্বারা ব্যাপ্ত। সুবর্ণই উহার আধার; সুবর্ণ হইতেই উহার উৎপত্তি সুবর্ণেই উহার স্থিতি এবং উহা ভাঙ্গিলে সুবর্ণই থাকিবে। কুম্ভকার মৃত্তিকা হইতে কত দ্রব্য প্রস্তুত করে। হাঁড়ি, কলসী, সরা, নানাবিধ পুতুল মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হয়। ঐ সকল দ্রব্যের নানা নাম ও নানা রূপ হইলেও উহা মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে; মৃত্তিকা হইতেই উহার উৎপত্তি, মৃত্তিকাতেই উহার স্থিতি, মৃত্তিকাতেই উহার লয়। কাষ্ঠ হইতে কত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, চেয়ার, টেবিল, খাট, বাক্স প্রভৃতি নানা দ্রব্য নানা নাম ধারণ করিয়া আমাদের নানা কার্য্য সম্পাদন করে; কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য কাষ্ঠ ভিন্ন আর কিছুই নহে, উহা কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত, কাষ্ঠেই স্থিত এবং ভাঙ্গিয়া গেলে কাষ্ঠই অবশিষ্ঠ থাকে। অতএব ঐ সকল দ্রব্য কাষ্ঠ দ্বারা ব্যাপ্ত। উহার নাম ও রূপ অনিত্য কিন্তু উহার আধার কাষ্ঠই অপেক্ষাকৃত নিত্য।

সেইরূপ এই বিশাল অসংখ্য নামধেয় ও অসংখ্য রূপবিশিষ্ঠ জগৎ সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে আদিতে আবির্ভূত হইয়াছে, অন্তে তাঁহাতেই তিরোভূত হইবে, এবং মধ্যে তাঁহাতেই অবস্থিত আছে। জগৎ প্রকাশ কালে সমগ্র জগৎ পরমাত্মা দ্বারাই ব্যাপ্ত। এই শ্লোকার্দ্ধেই উপনিষদের সমুদয় শিক্ষা অতি সংক্ষেপে নিহিত হইয়াছে। যিনি সম্যকরূপে ইহার অর্থ উপলব্ধি করিয়া সেই মত নিজ আচরণ অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই মুক্ত। অতএব ইহার সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং সেই মত কার্য্য করা অতি কঠিন। আমরা অজ্ঞান, ভেদজ্ঞানী মানব ইহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে অনবরত এই শ্লোকের ধ্যান করিতে হইবে ইহার জন্ম জন্মান্তর ধ্যান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া সত্যজ্ঞান দ্বারা আমাদের বুদ্ধি আলোকিত হইবে এবং আমরা মুক্তিমার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া অবশেষে আমাদের পিতামাতা, আমাদের আত্মা, আমাদের স্বরূপ, সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা পরমেশ্বরে উপশমিত হইব।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা,

সেই কারণে বিষয়াসক্তি ত্যাগ দ্বারা আত্মাকে ভোগ কর। অতএব বৈরাগ্য দ্বারা আত্মজ্ঞানরূপ সুখভোগ কর। যদি এই সমস্ত জগৎ নশ্বর হইল, যদি এ সমস্তই মিথ্যা, কেবল সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরই সত্য তবে এ সকল লইয়া ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? আমরা চতুর্দ্দিকে যে সকল বস্তু দেখি এবং যাহা লইয়া নিজের চিত্তবিনোদ করি, তাহা যদি সকলই মিথ্যা হয় তবে সেই সকল পদার্থ প্রতি আমাদের হৃদয়ে যে আসক্তি আছে তাহা ত্যাগের নিতান্ত আবশ্যক। ধন, মান, যশ পুত্র, কলত্র, সকলই অস্থায়ী ও অনিত্য; অদ্য যাহা লইয়া আমি এত ব্যস্ত কল্য তাহা হয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। যে পুত্র বা কলত্রকে আমি প্রাণসম ভালবাসি তাহার সময় আসিলে সে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, আমি কোন মতে তাহাকে রাখিতে পারিব না। যে মান ও যশ এক্ষণে আমার বলিয়া আমি গর্ব্ব করিতেছি তাহা হয়ত সামান্য কারণে নষ্ট হইবে, লোকে আর আমাকে সেরূপ সম্মান করিবে না, সে যশ আর আমার থাকিবে না। আর আমিও ত চিরজীবী নহি; আমার জীবনও নশ্বর, অতি ক্ষণস্থায়ী। আমিই বা কতকাল বাঁচিব। মরিলে ঐ মান ঐ যশ লইয়া কি করিব। উহা আমার কোন কার্য্যে আসিবে। অতএব বৈরাগ্য অভ্যাস কর। যে সকল বস্তু এক্ষণে তোমার নিকট প্রেয় বোধ হয়, যে সকল বস্তু প্রাপ্তির জন্য তুমি এত যত্ন এত চেষ্টা করিতেছ এবং এত উদ্বিগ্ন আছ তাহার লালসা ত্যাগ কর। আমার পুত্র আমার স্ত্রী আমার দ্রব্য ইত্যাদি চিন্তাতে মগ্ন থাকিও না। অহং ভাব ত্যাগকর। আমার আমার করিয়া বিব্রত হইও না। বৈরাগ্য অভ্যাস কর।

বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য কাহাকে বলে? বিষয়াসক্তি ত্যাগই বৈরাগ্য। ঈশোপনিষদে আত্মজ্ঞান শিক্ষাদান হইতেছে; প্রথম শ্লোকার্দ্ধে জগৎ নশ্বর ও পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী তাহা বলা হইল। এই জ্ঞানশিক্ষা সহজ নহে; এক্ষণে আমরা কেবল ইহা কর্ণে শুনিলাম, হৃদয়ে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যে দিন পারিব, যে দিন পরমাত্মা পরমেশ্বরকে সর্ব্বজীব ও সর্ব্ব বস্তুতে দেখিব, সে দিন আমার পূর্ণ বিবেক লাভ হইবে, আমি মুক্ত হইব। অতএব প্রথম শ্লোকার্দ্ধ ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ আমাদের বিবেক লাভ হইবে। এক্ষণে এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে যাহাতে বৈরাগ্য লাভ হয় তাহাই বলা হইতেছে। ঈশ্বর লাভের উপায় বিবেক ও বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য না হইলে ঈশ্বর লাভ হয় না। অতএব উপনিষদ শিক্ষা দিতেছেন বিষয়াসক্তি ত্যাগ কর কেন না বিষয় অবিনশ্বর, অস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর। যে দ্রব্য ঐরূপ, তাহার জন্য ব্যস্ত হওয়া কি উচিত। তাহা ত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর বস্তু লাভে যত্নবান হও।

বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিবে, কিন্তু বিষয় ভোগ ত্যাগ করা প্রয়োজন নাই, অথবা বিষয়ভোগ ত্যাগ মানবের পক্ষে অসম্ভব। আমি দেহী আমার দেহ রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক, খাদ্য দ্বারা দেহ রক্ষা হয় খাদ্যের অভাবে দেহের বিনাশ হয়। খাদ্য রসনাকে পরিতৃপ্ত করে; এজন্য খাদ্য রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়। কিন্তু ইহা অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ ইহা ত্যাগ অসম্ভব; ইহার উপভোগ অনিবার্য্য। অতএব কিরূপে ইহার উপভোগ করিব। ইহার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া দেহরক্ষা কর্ত্তব্য জ্ঞানে অন্নাদি ভোজন করিব। ভোজনে যে সুখ হয় তাহা উপভোগ করিব বটে কিন্তু তাহাতে আসক্তি থাকিবে না। অর্থাৎ ভোজনে সুখ হয় বলিয়া অধিক খাইব না অথবা ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে খাইব না এবং যে খাদ্য রসনার প্রিয় সেই খাদ্যই খাইব অপর স্বাস্থ্যকর খাদ্য খাইব না এরূপ করিব না, অথবা ক্রমাগত বা অপর সময়ে খাদ্যের চিন্তা করিব না। এক কথায় বলিতে গেলে পেটুক হইব না। যাহার খাদ্যে অধিক আসক্তি আছে তাহাকে পেটুক বলা যায়। আর একটী উদাহরণ দেখা যাউক। আমি গৃহী; আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি পরিবার বর্গ আছে; উহাদের ভরণ-পোষণ আমার উপর নির্ভর করিতেছে। ঐ ভরণপোষণ জন্য আমার অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক; ইহা আমার কর্ত্তব্য, ইহাই আমার জীবনের প্রধান কার্য্য; ইহা যদি না করি তাহা হইলে কর্ত্তব্যে বিমুখ হওয়া হইল। অতএব অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে, এবং তজ্জন্য যে পরিশ্রম, যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা করা প্রয়োজন তাহা করা আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নিতান্ত অর্থলোলুপ হওয়া উচিত নহে; অর্থলাভের জন্য চেষ্টা করিবে বটে কিন্তু তজ্জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিবে না অথবা অপর কর্ত্তব্য ত্যাগ করিবে না। মানবের ত্রিবিধ কর্ত্তব্য (১) ঈশ্বরোপাসনা (২) দেশ ও সমাজসেবা (৩) পরিবার প্রতিপালন। অর্থোপার্জ্জন দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্ত্তব্যের অতি ক্ষুদ্র অংশ; অতএব অর্থোপার্জ্জনে আসক্ত হইয়া অপর কর্ত্তব্য ভুলিবে না। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি সকল কর্ম্মই যথাবিধ সম্পাদন করেন, কোন একটীর প্রতি আসক্ত হইয়া অপরটীর অবহেলা করেন না। যিনি কর্ম্মযোগী তিনি সকল কর্ম্মই নিষ্কাম ভাবে করেন। কিছু পরিমাণ ধন সঞ্চয় করা

বিষয়াসক্তি।

মানবের পক্ষে প্রয়োজন কিন্তু তজ্জন্য প্রাণ মন সংযোগ দ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করা অথবা বহুধন উপার্জ্জন করিয়া তাহা বিলাসিতায় ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে; যাহারা ঐরূপ, তাহারা ধনাসক্ত, তাহারা অর্থকেই মানব জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিয়া তাহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে। অর্থকে প্রধান লক্ষ্য না করিয়া উহা কেবল অপর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মনে করিয়া অপরাপর কর্ত্তব্যের সহিত শমদম অবলম্বনে অনাসক্তভাবে অর্থোপার্জ্জন যিনি করেন তিনিই যথার্থ বৈরাগ্যবান; তাঁহার মনের এই অনাসক্ত ভাবই বৈরাগ্য। শ্রীমৎভগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়াছেন কর্ম্মত্যাগ শ্রেয় নহে; কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। অতএব বিষয় সকল নশ্বর জ্ঞানে তাহাতে আসক্তি ত্যাগ কর।

এই বৈরাগ্য কিরূপে লাভ করিব? কিরূপে আমার হৃদয় বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে পারিবে? চিন্তা ও অভ্যাসের দ্বারা। জগৎ যে নশ্বর তাহা কখন ভুলিবে না। যখনই হৃদয়ে বিষয় বাসনা উপস্থিত হইবে; যখনই ধন, যশ, ক্ষমতা প্রাপ্তির ইচ্ছা বলবতী হইবে, তখনই মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবে যে ঐ সকল বিষয় নশ্বর, উহা আমার নিকট চিরকাল থাকিবে না, সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে ঐ সকল প্রয়োজন অথবা সংসার ধর্ম্ম পালনে উহা আমাদের সহায়, তদ্ব্যতীত উহার অপর মূল্য কিছুই নাই। আমাদের নিত্য অবিনশ্বর আত্মার পক্ষে উহা কোনই আবশ্যকে আইসে না। মানবের কর্ম্ম সাধন জন্য ঐ সকল বিষয় যতদূর নিতান্ত প্রয়োজন তাহা লাভেরই চেষ্টা করিব তদ্ব্যতীত অধিক আয়ার নিষ্প্রয়োজনীয়; এবং উহাতে আসক্ত হইয়া স্বকীয় প্রধান কার্য্য ঈশ্বরোপাসনা ও অপরাপর কার্য্য অর্থাৎ মানব জাতির বা স্বদেশ ও স্বজাতির নিষ্কাম সেবা ভুলিব না। ঐ সকল বিষয় প্রাপ্তিই মানব জীবনের লক্ষ্য নহে উহা কেবল মনুষ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধনের কথঞ্চিৎ সহায়। ধনের আদর ধনের জন্য করিবে না উহা হইতে পরিবার প্রতিপালনরূপ স্বকর্ম্ম সাধিত হয় বলিয়াই ঐ পরিমাণে উহার আদর করিবে। ধন ক্ষমতা, যশ দ্বারা কোন কোন কর্ম্ম সম্পাদিত হয় অতএব উহা লাভের জন্য যত্ন করিবে বটে কিন্তু উহাই একমাত্র লক্ষ্য মনে করিবে না। অপর কর্ত্তব্য হইতে হৃদয় মন অপসারিত করিয়া উহাতেই একেবারে ঢালিয়া দিবে না। যখন দেখিবে তোমার মন, ধন ক্ষমতা যশ, প্রার্থী হইয়া তোমার অপর কর্ম্ম সাধনে বিরতি বা অবহেলা আচরণ করিতেছে; তখন দেখিবে তুমি ঐ সকল প্রের কর্ম্মে আসক্ত হইয়া শ্রেয় কর্ম্মে অবহেলা করিতেছ তখনই বুঝিবে তুমি শুভ মার্গ ত্যাগ করিয়া অশুভ হেয় মার্গ অবলম্বন করিয়াছ। যখন তুমি কেবল কর্ত্তব্য সাধন জন্য, ঐ সকল বিষয়কে

কর্ত্তব্য সাধনের উপায় জ্ঞান করিয়া উহা লাভের জন্য চেষ্টা করিবে, আত্মপ্রীতি আত্মগরিমা বা আত্মসুখ জন্য নহে, তখনই তুমি সত্য মার্গ অবলম্বন করিয়াছ বুঝিতে হইবে। কর্ত্তব্য সাধন জন্য বিষয়াকাঙ্ক্ষা করা এবং তজ্জন্য যতটুকু অর্থ প্রয়োজন তাহাই উপার্জ্জন করা বৈরাগ্যের প্রতিকূল নহে। সংসারে তোমার যে কিছু কার্য্য করিতে হইবে তাহা ঐ ভাবে করিতে অভ্যাস করিবে। এই অভ্যাস দ্বারাই আসক্তি রহিত হইবে। এই অভ্যাস দ্বারাই বৈরাগ্য লাভ করিবে।

মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ।১।

ভাষ্যকারেরা এই শ্লোকাংশের দুইটী অর্থ করেন :—প্রথম, অপরের ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। অপর অর্থ, লোভ করিও না ধন কাহার?—এই দ্বিতীয় অর্থই প্রশস্ত; স্বকীয় ও পরকীয় উভয়বিধ কাম্য পদার্থেই লোভ ত্যাগকর। পরের অর্থে লোভ করা অন্যায় বটেই পরদ্রব্যে লোভ নিশ্চয়ই করিবে না অসদুপায়ে পরদ্রব্য প্রাপ্তির চেষ্টা নিশ্চয়ই করিবে না কারণ তাহা পাপ। সদুপায়েও প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও ত্যাগ করিবে। যিনি মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে লোভ একান্ত ক্ষতিকারক, তাহার হৃদয়ে যতক্ষণ লোভ থাকিবে তিনি ঐ মার্গে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। যিনি সংসারী, যিনি বিষয়াসক্ত, যিনি ইহকালের উন্নতির জন্য ব্যস্ত তাঁহার পক্ষেও লোভ বিঘ্নজনক ও কষ্টকর। যে সকল বিষয়ে আমাদের লোভ হয় তাহা সকল কিছু প্রাপ্তি সম্ভব নহে হৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা কিছু মিটিবার সম্ভব নহে, এবং আকাঙ্ক্ষা না মিটিলে কেবল কষ্টই হয়। অতএব মুমুক্ষু ও বিষয়ী উভয়েরই পক্ষেই লোভ অনুচিত হইতেছে।

ধন কাহার? কাহারও নহে। এখানে ধন শব্দে সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু বুঝিবে। লক্ষ্মী চঞ্চলা তিনি অধিক দিন একস্থানে থাকেন না। অদ্য যে ধনী কল্য হয়ত সে দরিদ্র; অদ্য যে দরিদ্র কল্য হয়ত সে ধনী হইল। আমি আজীবন পরিশ্রম করিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করিলাম, মৃত্যু সময়ে সে ধন ফেলিয়া আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে। সে ধন অপরের ব্যবহারে আসিবে; হয়ত আমার উত্তরাধিকারী সেই কষ্ট সঞ্চিত ধন বৃথা ব্যয় অথবা মন্দকার্য্যে ব্যয় করিবে। ধনী যে কার্য্য একান্ত ঘৃণা করে তাহার পরলোকান্তে তাহার পুত্র সেই কার্য্যে পিতৃসঞ্চিত ধন নষ্ট করিতেছে। এইরূপ ঘটনা প্রত্যহ হইতেছে। অতএব ধনলালসা ত্যাগকর। যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং। নিজ কর্ম্মদ্বারা যে ধন লাভ হয় তাহা দ্বারাই নিজ চিত্ত প্রসন্ন কর। টাকা টাকা

করিয়া উন্মত্ত হইও না। অর্থান্বেষণে বিব্রত হইয়া অপর গুরুতর কর্ত্তব্য ত্যাগ করিও না।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২

প্রথম শ্লোকে জ্ঞান মার্গের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে কর্ম্ম মার্গের বিষয় উক্ত হইতেছে—ইহ লোকে শুভ কর্ম্ম করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবে। ইহা ভিন্ন নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষার অপর উপায় নাই।

ঈশোপনিষদের এই দ্বিতীয় শ্লোকটীর ভাবার্থ বুঝিবার জন্য কর্ম্ম কি ও সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহার আলোচনা প্রয়োজন, অতএব আমরা এই স্থলে ঐ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা উহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কর্ম্ম।

আমরা যাহা করি তাহাই কর্ম্ম। শয়ন, উপবেশন, দণ্ডায়ন, ধাবন, কথোপকথন প্রভৃতি সকল কার্য্যই কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মানব কর্ম্ম বিনা এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারে না কারণ জীবন ধারণ কেবল কতকগুলি কর্ম্ম সমষ্টি, যেরূপ, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ক্ষেপণ, খাদ্য পরিপাক করণ, শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচল করণ; চিন্তা করণ, সুখ দুঃখ বোধ করণ ইত্যাদি। কতকগুলি কর্ম্ম এরূপ আছে যাহা করিতে মানব অসমর্থ হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; অপর কতকগুলি কর্ম্ম এরূপ আছে যাহা না করিতে পারিলে জীবন নিষ্ফল বা অতিকষ্টকর হয়।

আমরা যে কিছু কর্ম্ম করি তাহা দেহদ্বারা; দেহই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র আমরা শরীরী, শরীরই আমাদের জীবন ধারণের প্রধান ক্ষেত্র; অতএব আমাদের যাহা কিছু কর্ম্ম আছে তাহা দেহদ্বারা সম্পন্ন হয়। দেহের সহিত পৃথিবীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ; পৃথ্বীজাত ও পৃথ্বীস্থিত দ্রব্যাদির দ্বারাই আমাদের দেহ সৃষ্ট ও পোষিত ও দেহের জন্ম হইতে আমাদের পার্থিব কর্ম্ম আরম্ভ হয় ও দেহের বিনাশেই পার্থিব কর্ম্ম শেষ হয়। আমরা যে সকল কর্ম্মকে মানসিক কর্ম্ম বলি তাহাও প্রথমে মন হইতে আরম্ভ হইয়া স্থূলদেহ দ্বারা সম্পাদিত হয়; যখন আমরা চিন্তা করি অথবা দয়া, দুঃখ, ক্রোধ প্রভৃতি কোন ভাব আমাদের মনে উদয় হয় তখন ঐ ভাবের শেষ কর্ম্ম আমাদের স্থূল শরীরের মস্তিষ্ক দ্বারা সম্পন্ন হয়। অতএব সকল কর্ম্মেরই সম্পন্ন স্থান দেহ।

এই দেহের বিনাশ হইলেই কর্ম্ম বন্ধ হইবে অতএব দেহের যাহাতে অসময়ে নাশ না হয়, যাহাতে অপরিণত বয়সে মৃত্যু না হয় তাহা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই

মানবদেহ সাধারণতঃ একশত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। সত্য বটে যোগীঋষিরা শতবর্ষের বহু উর্দ্ধকাল জীবিত থাকেন, তাঁহারা কি উপায়ে এরূপ দীর্ঘজীবন লাভ করেন তাহা আমরা অবগত নহি, এবং সে উপায় অবলম্বন করা আপাততঃ আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত; তাহা অবলম্বন করিতে গেলে আমাদিগকেও যোগী হইতে হইবে। অতএব গৃহীর পক্ষে শতবর্ষই জীবনের পরিমাণ ধরিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিবার চেষ্টা ও যত্ন করিবে। যাহাতে তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পার এবং সুস্থ শরীরে জীবন যাত্রা সম্পাদন করিতে পার এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম করিতে পার তৎপক্ষে যত্নবান হইবে।

কর্ম্মের দুই ভাব।

কর্ম্মের দুই ভাব—সকাম ও নিষ্কাম। এই দুই ভাবের সম্যক আলোচনা এস্থলে অসম্ভব তাহা করিতে গেলে ঐ সম্বন্ধেই একখানি পৃথক্ পুস্তক পূর্ণ হইয়া যায়। অতএব আমরা এস্থলে সংক্ষেপে উহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। সাধারণ মানবের অন্তঃকরণ স্বভাবতই বাসনা পূর্ণ। উহা সততই স্ত্রী, পুত্র, ধন, ক্ষমতা, যশ প্রভৃতি লাভের জন্যই বিব্রত। এই সকল বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মানব হৃদয়ে অতীব বলবতী; এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মানব যে সকল কর্ম্ম করে তাহা সকাম কর্ম্ম। ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছায় যে কর্ম্ম করা যায়, কোন বিষয় লাভের জন্য যে কর্ম্মে আমরা প্রবৃত্ত হই, কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কর্ম্মে আমরা রত থাকি এবং উদ্দেশ্য সফল হইলে বিরত হই, তাহাই সকাম কর্ম্ম। ধনলাভের জন্য আমি ব্যবসা করিতেছি, চাকরী করিতেছি আমরা নানাবিধ বিষয় কর্ম্ম করিতেছি এ সকলই যদি কেবল ধন কামনা করিয়া করি তাহা হইলে ইহা সকাম কর্ম্ম। সেইরূপ, ক্ষমতা বা যশোলাভ জন্য যে কর্ম্ম করি, পুণ্য সঞ্চয় অথবা স্বর্গলাভের জন্যও যাহা করি তাহাও কামনার সহিত করি সুতরাং তাহাও সকাম। চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে সাধারণ মনুষ্য যাহা কিছু করে তাহাই কামনা পূর্ণ ও আকাঙ্খা-ময় অতএব সকাম। আমার নিজের বা পরিবারবর্গের অথবা স্বজাতির ও স্বদেশের কিম্বা সমগ্র মানব জাতির লাভ বা উন্নতিকল্পে ফলাকাঙ্খী হইয়া যাহা কিছু করি তাহাই সকাম কর্ম্ম। যে কর্ম্মের ফল আমাদের প্রিয়, যে কর্ম্ম সফল হইলে আমরা উল্লাসিত হই এবং নিষ্ফল হইলে দুঃখিত হই তাহা মঙ্গল কর্ম্মই হউক অথবা অমঙ্গল কর্ম্মই হউক তাহা শ্রেয়ই হউক বা হেয়ই হউক তাহা সকাম কর্ম্ম।

কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—শুভ, অশুভ ও মিশ্র। যে কর্ম্ম শুভ ফল উৎপাদন করে, অর্থাৎ যাহা মানবের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক

অথবা বৈষয়িক অভাব দূরীকরণার্থ প্রযুক্ত হয় এবং যাহা একের অভাব পূরণ জন্য অপরের অভাব বৃদ্ধি না করে তাহাই শুভ কর্ম্ম। যদিচ শুভ কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা আমরা সকলেই কিছু না কিছু বুঝি এবং সেই বোধ অনুসারে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করি তত্রাচ উহার সঠিক পরিভাষা * দেওয়া কঠিন। অতএব উহা আমরা সাধারণ উদাহরণ দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিব। ঈশ্বরারাধনা, ধর্ম্মোপদেশ, বিদ্যাদান, সৎপাত্রে দান প্রভৃতি কর্ম্ম সকল শুভ; ইহাতে কাহারও পক্ষে অশুভ ফল প্রসব হইতে পারে না। ঈশ্বরারাধনা দ্বারা আমার মন পবিত্র ও ভক্তিযুক্ত হয় উহাতে আমার ধর্ম্মে উন্নতি হয় এবং আমাকে মোক্ষমার্গে অগ্রসর করিয়া দেয় অতএব উহা আমার পক্ষে নিতান্ত শুভ ফল উৎপাদন করে; এবং উহাতে কাহারও অনিষ্ট হয় না। বরঞ্চ উহাতে আমার পার্শ্ববর্ত্তী লোকের উপকারও হইতে পারে। অতএব উহা শুভ কর্ম্ম। ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা আমি উপদিষ্টের অজ্ঞানতা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি এবং তদ্দ্বারা আমারও ধর্ম্মচর্চ্চা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহার দ্বারা কাহারও অনিষ্ট সম্পাদন হইতেছে না অতএব ইহা শুভ কর্ম্ম। মনে কর যে দেশে জলাভাব আছে তথায় পুষ্করিণী খনন করিয়া দিলাম, কোন স্থানে নূতন রাস্তা প্রস্তুত দ্বারা তথাকার লোকের কষ্ট লাঘব করিলাম অথবা বিদ্যালয় বা পুস্তকালয় স্থাপন দ্বারা তৎস্থানীয় লোকের জ্ঞানার্জ্জনে সুবিধা করিয়া দিলাম। এ সকলই শুভ কার্য্য।

অশুভ কর্ম্ম।

যে কর্ম্ম মানবের অভাব বা দুঃখ বৃদ্ধি করে তাহা অশুভ; যে কর্ম্ম কোন ব্যক্তিরই পক্ষে মঙ্গলজনক নহে তাহা অশুভ যেমন নরহত্যা—ইহা কাহারও পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে, ইহাতে কাহারও প্রকৃত লাভ নাই যে কার্য্য অধিকাংশ লোকের পক্ষে ক্ষতিজনক তাহাই অশুভ কর্ম্ম। কোন কর্ম্মটী শুভ কোন কর্ম্ম অশুভ তাহা বিচার করিতে গেলে ইহাই দেখা আবশ্যক যে উক্ত কার্য্য দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও উন্নতি হইবে কি না এবং উহা মানব জাতির বা সমাজের পক্ষে উপকারী কি না। যে কার্য্য হইতে কর্ম্মকর্ত্তার এবং যে ব্যক্তির প্রতি কর্ম্ম প্রয়োগ হইল উভয়ের অথবা উভয়ই যে সমাজস্থ সেই সমাজের বা সমগ্র মানব জাতির পক্ষে অমঙ্গলদায়ক তাহাই অশুভ। মানব সমাজের কতকগুলি সাধারণ নৈতিক নিয়ম আছে সেই নৈতিক নিয়মের বিরুদ্ধ কার্য্যগুলিই অশুভ কার্য্য। যদিচ ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন

* Definition.

নিয়ম আছে তত্রাচ অধিকাংশ সমাজ মধ্যে কতকগুলি নিয়ম একই রূপ; ঐ সকল নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য অশুভ, অতএব পরিহার্য্য।

যে কর্ম্ম শুভাশুভ ফল উৎপাদন করে তাহা মিশ্র কর্ম্ম। তাহা হয়ত একের পক্ষে মঙ্গলজনক অপরের পক্ষে অমঙ্গলকর। দুই একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। অসৎপাত্রে না জানিয়া দান একটী মিশ্র কর্ম্ম; দাতা দান গ্রাহীর প্রতি যে দয়ানুভব করিয়া দান করিলেন এবং কথঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করিলেন তাহাতে তাঁহার মনের নৈতিক উন্নতি হইল বটে কিন্তু যে ব্যক্তি দান গ্রহণ করিল দাতাকে প্রবঞ্চনা করণ জন্য তাহার মনের অবনতি হইল। ধনোপার্জ্জন একটী মিশ্র কর্ম্ম; ইহাতে শুভ ও অশুভ উভয় ফলই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। এস্থলে আমরা সদুপায়ে ধনোপার্জ্জনের কথা বলিতেছি, অসদুপায়ে ধনোপার্জ্জন এস্থলে আলোচ্য নহে, উহা অশুভ কার্য্য। সদুপায়ে যে ব্যক্তি ধনোপার্জ্জন করে তাহাকে শারীরিক ও মানসিক কতকগুলি পরিশ্রম করিতে হয়। আলস্য মানবের পক্ষে অতি অমঙ্গলদায়ক। ধনাভিলাষী উদ্যোগী ব্যক্তিকে আলস্য ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম করিতে হয় এবং ঐরূপ পরিশ্রম করায় এবং ঐরূপ পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সমধিক চর্চ্চার হেতু উহা অধিকতর পুষ্ট ও কার্য্যক্ষম হয় ইহাতে মানবের উন্নতি হইয়া শুভ ফল উৎপাদন করে। মনুষ্য ইহাতে সদা সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলে মানবের ষড়রিপুর মধ্যে এক প্রধান রিপু লোভের বৃদ্ধি হয়। লোভের বশবর্ত্তী মানব অপর প্রয়োজনীয় কার্য্য অবহেলা করে এবং অনবরত এই কার্য্যে রত থাকে, ইহাতে তাহার মনের নৈতিক অবনতি হয়। এই কারণে ইহাকে মিশ্র কর্ম্ম বলা যায়। এইরূপ সাধারণ মানবের অধিকাংশ কর্ম্মই মিশ্র ফলদায়ক।

মিশ্র।

এক্ষণে নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। উপরে বলা হইয়াছে যে ফলানুরাগী হইয়া আমরা যে কর্ম্ম করি তাহা সকাম। ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে কর্ম্ম করা যায় তাহা নিষ্কাম। দান করিলে লোকে সুখ্যাতি করিবে, বা পুণ্য হইবে, স্বর্গলাভ হইবে, এ উদ্দেশে নহে, যথাসাধ্য দান করা সকলের কর্ত্তব্য, অভাবী লোকের অভাব পূরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বকীয় কোন স্বার্থলাভের আকাঙ্খা না করিয়া যে দান তাহাই নিষ্কাম। আমার কর্ত্তব্য আমি করিতেছি, উহা না করিলে কর্ত্তব্যের ক্রটী হইবে, উহার লাভালাভের প্রতি লক্ষ্য না করা, এরূপ মনোভাবের সহিত যে কর্ম্ম করা যায় তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম। আমরা

নিষ্কাম কর্ম্ম।

যে সকল কার্য্য করি তাহা দুই প্রকার মনোভাবের সহিত করা যাইতে পারে, প্রথম সুখের জন্য, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য জ্ঞানে। এই দ্বিতীয় কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম! উদাহরণ দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। তুমি জ্ঞানী, বহু ধর্ম্মপুস্তকপাঠে ও সদাসর্ব্বদা ধর্ম্ম চিন্তা দ্বারা তোমার ধর্ম্মজ্ঞান হইয়াছে, তোমার কর্ত্তব্য লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া। তুমি এই জ্ঞান দান কর্ত্তব্য বিবেচনায় যদি কর, ইহা যশ ও পুণ্য লাভের জন্য নহে এই জ্ঞানে যদি কর তাহা হইলে ইহা নিষ্কাম ভাবে করা হইল। এই জ্ঞান দান জন্য তোমার যশোলাভ হওয়া সম্ভব, তুমি জান ইহা দ্বারা তোমার নিশ্চয়ই সুকৃতি অর্জ্জন হইবে এবং তজ্জন্য পর জন্মে তোমার সুফল ফলিবে; কিন্তু তুমি যদি ঐ সকল ফল কামনায় এই কর্ম্ম না কর, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান লাভালাভের প্রতি তোমার দৃষ্টি না থাকে; ঐ লাভালাভের দ্বারা তুমি ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত না হও কেবল কর্ম্ম করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়; তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম হইল। সকাম বা নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ম্মীর মনোভাবের উপর নির্ভর করে। কর্ম্মী স্বকীয় বা পরকীয় লাভের উদ্দেশে তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া যে কার্য্য করে তাহা সকাম, স্বকীয় বা পরকীয় লাভ যে কর্ম্মের লক্ষ্য নহে কেবল কর্ম্মই যে কর্ম্মের লক্ষ্য তাহাই নিষ্কাম। সকল প্রকার কর্ম্মই সকাম বা নিষ্কাম ভাবে করা যাইতে পারে। উদাহরণ দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। নরহত্যা মহাপাপ বলিয়া সকল মানব সমাজে গণ্য হইয়া থাকে। যদি বিনা কারণে অথবা কোন কারণে আমি কোন মানবের প্রাণনাশ করি তাহা হইলে আমি ঐ মহাপাপ করিলাম তজ্জন্য আমি সমাজের নিকট দোষী হইলাম এবং বিচারপতির নিকট দণ্ডনীয় হইলাম। বিচারপতি আমার প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন ও জল্লাদ আমার প্রাণ দণ্ড করিল। আমি কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির মানসে নরহত্যা করিলাম এজন্য আমার কর্ম্ম সকাম ও ঘোরতর অশুভ কর্ম্ম, উহা মহাপাপ। বিচারপতি আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ লইয়া, দেশের আইন অনুসারে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড উচিত এই জন্য, তিনি বিচারপতি তাঁহার উহা কর্ত্তব্য বিবেচনায়, প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন তিনি নিষ্কামভাবে ঐ কার্য্যের আজ্ঞা দিলেন এবং জল্লাদ বিচারপতির আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য জ্ঞানে উহাই সম্পাদন করিল। অতএব এই দুই ব্যক্তিই নরহত্যা নিষ্কাম ভাবে করিলেন উহাদের পক্ষে ঐ কার্য্য পাপ নহে; উহা তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু আমি একজন তৃতীয় ব্যক্তি, আমি দেখিলাম এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে নরহত্যা করিল আমি রাজ-কর্ম্মচারীর নিকট ধৃত করাইতে পারিতাম তাহা না করিয়া আমি স্বয়ং তাহাকে

শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে হত্যা করিলাম অতএব আমি ও পাপ করিলাম আমার কর্ত্তব্য উহা নহে আমার কর্ত্তব্য উহাকে ধরাইয়া দেওয়া অথবা উহার বিরুদ্ধে বিচারপতির নিকট সাক্ষ্য দেওয়া অতএব আমার কর্ত্তব্যের অধিক কার্য্য করায় ঐ কার্য্য নিষ্কাম ভাবে করিলাম না। উহা সকামভাবে করা হইল; নরহত্যা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যে ক্রোধ অথবা দ্বেষ হইল তাহা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঐ কার্য্য করিলাম অতএব উহা সকাম কর্ম্ম নিষ্কাম নহে। অপর একটী উদাহরণ দেখা যাউক; বাঙ্গালার অনেক স্থান এরূপ আছে যাহা রোগ প্রপীড়িত। তুমি ধনী, তোমার কর্ত্তব্য ধনের সদ্ব্যবহার করা। তুমি সেই স্থলে চিকিৎসালয় স্থাপন করিলে। এই কার্য্য তুমি সকাম ও নিষ্কাম উভয় ভাবেই করিতে পার। যদি তুমি প্রশংসা লাভের জন্য অথবা শাসন কর্ত্তার নিকট হইতে উপাধি লাভের প্রত্যাশায় কিম্বা পুণ্য লাভের উদ্দেশে এই কার্য্য কর তাহা হইলে তুমি উহা সকাম ভাবে করিলে কিন্তু যদি তুমি উহা কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর, যদি তুমি ইহা মনে কর যে ঈশ্বর তোমাকে ধন দিয়াছেন নির্ধনের সাহায্য জন্য, নির্ধনের উপকার জন্য, যদি তুমি ইহা বুঝ যে ধন তোমার নহে ইহা অপরের জন্য তোমার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; ইহা ঈশ্বরের, তাঁহার কার্য্য জন্য তোমার নিকট রাখা হইয়াছে; তুমি তাঁহার কর্ম্মচারী মাত্র তাঁহার কার্য্যেই উহা ব্যয় হইবে তাহা হইলে তুমি নিষ্কাম ভাবে ঐ কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মফলে স্পৃহা না থাকারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। আমরা শাস্ত্র বিহিত শ্রাদ্ধাদি যে সকল কর্ম্ম করি তাহার শেষ মন্ত্র দ্বারা আমরা সেই কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করি ঐ মন্ত্র আমরা, ব্রাহ্মণের দ্বারা উক্ত হইয়া অর্থ না বুঝিয়া তোতা পাখীর ন্যায় আবৃত্তি করি। সুতরাং উহার অভিপ্রায় যে নিষ্কাম কর্ম্ম তাহা হয় না। পরন্তু যাজক ও পূজক উভয়েই ঐ কর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস হইতে বঞ্চিত হই।

প্রত্যেক মানবেরই কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে এই সকল কর্ম্ম করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করাই মানবের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলেই প্রকৃত সুখ লাভ হয়। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম চারিভাগে বিভক্ত করা যায় যথা:—

কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১। স্বকীয় ও স্বপরিবারের ভরণপোষণ ও মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন।

২। স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতি সম্পাদন।

৩। মানব জাতির উন্নতি সম্পাদন।

৪। ঈশ্বরারাধনা।

এ সকল কার্য্যই কিছু না কিছু যথাসাধ্য সম্পাদন করা সকল মানবেরই কর্ত্তব্য। ইহার কোনটীই একেবারে অবহেলা করা কাহারও উচিত নহে।

এক্ষণে দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। জ্ঞানমার্গের কথা প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে। যদি তুমি বিষয়ানুরাগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান মার্গ অনুসরণ করিতে না পার তাহা হইলে তোমার পক্ষে কোন পথ অবলম্বন করা উচিত তাহাই দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানব ইহ-লোকে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে, কর্ম্মই মানবজীবনের কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য। কর্ম্মত্যাগ মানবের পক্ষে অসম্ভব ; কোন না কোন কর্ম্ম মানব অনবরত করিতেছে। কর্ম্ম ভিন্ন মানবের শরীর যাত্রা সম্পন্ন হয় না। সমস্ত বিশ্বসংসারস্থ জীবই কোন না কোন কর্ম্ম করিতেছে। যিনি বিশ্বসংসারের স্রষ্টা ও আধার যাঁহা হইতে এই সমগ্র বিশ্ব উদ্ভূত ও যাঁহাতেই লীন হয় তিনিও অনবরত কর্ম্ম করিতেছেন। তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে প্রলয় উপস্থিত হয় ও সমস্ত সংসারের নাশ হয়। অতএব হে মানব তুমি ক্রমাগত কর্ম্ম কর। কর্ম্ম করিতে গেলে জীবিত থাকা প্রয়োজন।

দীর্ঘ জীবনের আবশ্যকতা।

অধিকাংশ কর্ম্মই সময় সাপেক্ষ। মনে কর তুমি স্বজাতি বা স্বদেশের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ। মনে কর তোমার দেশে লোক সকল অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, তুমি যাহাতে দেশমধ্যে শিক্ষা প্রচলন হয় তাহার চেষ্টা করিতেছ। এ কার্য্য এক দিনে, এক বৎসরে বা দশ বৎসরে অথবা এক জনের কিম্বা অল্প লোকের যত্নে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহার জন্য বহু লোককে তোমার মতে আনয়ন করিয়া উহাদের সাহায্যে দীর্ঘকালব্যাপী অনবরত চেষ্টা, বহু অর্থব্যয়, বহু পরিশ্রম করিতে হইবে। যদি কার্য্য আরম্ভ করিয়াই অথবা অল্প মাত্র সাধন করিয়াই তোমার মৃত্যু হইল তাহা হইলে ঐ কার্য্য হয়ত অসম্পূর্ণ রহিল। হয়ত অপর কেহ তুমি যাহা করিতেছিলে তাহা করিল না অথবা তুমি যেরূপভাবে করিতেছিলে সেরূপ ভাবে করিল না অতএব ঐ কর্ম্ম কিছুদিন স্থগিত রহিল। অতএব তোমারস্বল্প জীবন ঐ কর্ম্মের বিঘ্নকর হইল। এজন্য এই শ্লোকে বলা হইতেছে দীর্ঘজীবনের আবশ্যক। অতএব দীর্ঘজীবনের আকাঙ্খা শুভ কর্ম্ম সাধন জন্য করিবে ; স্বকীয় ভোগের জন্য নহে।

মানব সকামী। আমাদের অধিকাংশ কর্ম্মই সকাম এবং ঐ সকল সকাম কর্ম্মই আমরা ক্রমাগত করিতেছি ; কিন্তু মোক্ষলাভ করিতে গেলে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে

হইবে। উহা শিক্ষা করা আবশ্যক। কিরূপে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারিব তাহা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ক্রমাগত শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্ম্ম করিবে, আজীবন উহা করিতে করিতে মন পবিত্র ও স্বার্থশূন্য হইবে।

শাস্ত্রীয় শুভ কর্ম্ম

শাস্ত্রীয় শুভ কর্ম্ম কি? শাস্ত্রে নানারূপ শুভ কর্ম্মের বিধান আছে, তন্মধ্যে দুই একটীর উল্লেখ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ঈশ্বরারাধনা একটী শুভ কর্ম্ম। ঐ কর্ম্ম অনবরত করিতে করিতে ঈশ্বর ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং তৎসঙ্গে স্বার্থপরতার নাশ হইবে। স্বার্থের নাশ হইতে তোমার অন্তঃকরণে নিষ্কাম ভাব ক্রমশঃ আবির্ভাব হইবে। যজ্ঞাদি কার্য্য শুভ কর্ম্ম; পুষ্করিণী খননাদি পূর্ত্তকার্য্য শুভ কর্ম্ম। ঐ সকল কার্য্য করিবার জন্য কতকটা স্বার্থত্যাগ আবশ্যক সুতরাং উহা সকামভাবে করিলেও উহা অল্পে অল্পে স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দিবে।

অভ্যাস।

হৃদয় হইতে সকাম ভাব দূরীকৃত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিষ্কাম ভাব আনয়ন করা অতি কঠিন। কেবল অভ্যাস দ্বারা ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। অতএব ক্রমাগত শুভ কর্ম্ম দ্বারা স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিবে এবং অনবরত শুভকর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা মন ক্রমশঃ উন্নত, পবিত্র ও নির্ম্মল হইবে; বৈষয়িকতা, সংসারের মোহ, অল্পে অল্পে হ্রাস হইবে, নির্লিপ্ততা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সকামী বিষয়ী ব্যক্তি এইরূপে শুভ কর্ম্মের অভ্যাস দ্বারা নিষ্কাম ভাব লাভ করিবে; ইহা ব্যতীত অপর পন্থা নাই।

এই শ্লোকে কর্ম্ম করার কথাই বলা হইয়াছে; কর্ম্মত্যাগের কথা বলা হয় নাই। অনেকে মনে করেন গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রম ভাল; কারণ গৃহস্থাশ্রমে অনেক সময় ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইতে হয়

কর্ম্মত্যাগ।

ধনোপার্জ্জন প্রভৃতি বৃথা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় ঈশ্বরোপাসনার সময় পাওয়া যায় না; মন সর্ব্বদা সাংসারিক কার্য্যে বিব্রত থাকে অতএব ঐ আশ্রম ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে বিরোধী; সুতরাং গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা সকল মানবেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ঠিক নহে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কর্ম্মত্যাগ মানবের পক্ষে অসম্ভব; মানব কর্ম্ম করিতেই আসিয়াছে এবং অনবরত কর্ম্মই করিবে যাঁহাকে সন্ন্যাসী বলি, তিনিও ক্রমাগত কর্ম্ম করিতেছেন; ঈশ্বরারাধনা এবং ধর্ম্মোপদেশরূপ প্রধান কর্ম্ম তিনি করিতেছেন। অতএব সন্ন্যাসী কর্ম্মত্যাগী নহেন তিনিও আমার ন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন। আমার ন্যায় তাঁহাকেও শরীর পালন করিতে হয়; আমি মানসিক

বা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করি এবং তদ্বারা স্বকীয় ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ সম্পাদন করি, তিনি ভিক্ষাদ্বারা স্বকীয় খাদ্য ও বস্ত্র আহরণ করেন। কেবল প্রভেদ এই যে আমাকে অধিক পরিমাণে এই কার্য্য করিতে হয় তাঁহাকে অল্প পরিমাণে করিতে হয়। কিন্তু সকল ব্যক্তিই বাহ্যিক কর্ম্ম সম্পাদনের সময় ইচ্ছা করিলে হৃদয়ে ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারেন; যাঁহার হৃদয়ের অবস্থা ঐরূপ, যিনি তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা ঈশ্বরে ন্যস্ত করিয়া শারীরিক ও সাংসারিক কর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন তিনি প্রকৃতত্যাগী ও প্রকৃত সন্ন্যাসী। কর্ম্মফল ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, উহাই প্রকৃত সন্ন্যাস; কর্ম্মত্যাগ বিধেয় এবং সম্ভব নহে। আমরা উপরে যে চারিশ্রেণীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি তাহার মধ্যে একটি হেয় ও অপরটী শ্রেয় নহে। যিনি যে কার্য্য করিতে সক্ষম যিনি যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে সেই কার্য্যই শ্রেয়। প্রাক্তন কর্ম্মদ্বারা প্রত্যেক মনুষ্য কোন না কোন কর্ম্ম করিতেসক্ষম অতএব সেই কর্ম্ম করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যেস্থানে, যে পরিবারবর্গের মধ্যে জন্মিলে যেরূপ শরীর ও মন প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বজন্মাভ্যস্ত কর্ম্ম অধিকতর সুচারুরূপে করিবার সুবিধা হইবে ঈশ্বর তাঁহার জন্য সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। সকল কর্ম্মই করা আবশ্যক ও সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মই ঈশ্বরের কর্ম্ম। যিনি যে আশ্রমে আছেন তাঁহার পক্ষে সেই আশ্রমের কার্য্য করা আবশ্যক। যদি আমি সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া অপর কার্য্য করিতে সক্ষম হই নিশ্চয়ই অপর কার্য্য আমার হস্তে ন্যস্ত হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি গৃহী ২৫ বৎসর বয়সে আমি বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া ধনোপার্জ্জনে নিযুক্ত আছি, মনে কর ৫৫ বৎসর বয়সে আমার ধনোপার্জ্জন কার্য্য শেষ হইল আমি পুত্র পরিবারবর্গের ভরণপোষণ জন্য যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিলাম; আমি যদি অপর কর্ত্তব্যকার্য্যে মন না দিয়া থাকি; যদি এই ত্রিংশ বৎসর স্বদেশের কার্য্যে অথবা মানবজাতির কার্য্যে মনোযোগ না করিয়া থাকি তাহা হইলে সেই কার্য্য করিতে পারিব না অতএব আমার জীবন কষ্টকর হইবে আমি কর্ম্মহীন হইয়া আলস্যে সময়ক্ষেপ করিব। কিন্তু ধনোপার্জ্জনের সঙ্গে যদি অপর কর্ত্তব্যগুলির প্রতি মনোযোগ করিয়া থাকি তাহা হইলে ধনোপার্জ্জন শেষ হইলেই অনায়াসে অপর কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিতে পারিব। অতএব চারিশ্রেণীর কর্ত্তব্য কার্য্য সকলেরই করা আবশ্যক, উহা সকলের পক্ষেই বিধেয়।

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।৩

যাহারা আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী অতএব আত্মঘাতী তাহারা মৃত্যুর পর অন্ধ তমসাবৃত অসুরলোকে গমন করে।

পরমাত্মা পরমেশ্বর প্রধানতঃ দুইভাবে জগতে প্রকাশিত হন। এক আত্মা-অপর জড়। যাঁহারা জ্ঞানী ও সম্যকদর্শী তাঁহারা এই উভয় ভাবেই সেই নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প পরব্রহ্মেরই উপলব্ধি করেন। পরমাত্মা পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সর্ব্বদ্রব্যে বিরাজমান আছেন এবং তিনিই সর্ব্বদ্রব্য, তাহা আমরা প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিশেষরূপে দেখিয়াছি।

ঈশ্বরের দুইভাব।

এস্থলে সে বিষয়ের পুনরালোচনা অনাবশ্যক। যদিচ প্রকৃত জ্ঞানী পরমাত্মার এই উভয় ভাবেরই একত্র সমাবেশ সর্ব্বদ্রব্যে দর্শন করেন; কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের এই দিব্যদৃষ্টি নাই তাহারা পরব্রহ্মের এই দুইভাবকে বিভিন্ন মনে করে। অপর এক শ্রেণীর লোক আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে একেবারে অজ্ঞাত; তাহারা জড় পদার্থের অস্তিত্বই বিশ্বাস করে, জড়পদার্থ ভিন্ন যে অপর কিছু তত্ত্ব এ জগতে আছে তাহা তাহাদের উপলব্ধি নাই।

আত্মঘাতী।

তাহারা জড় লইয়াই ব্যস্ত, জড়জগতই তাহাদের জীবনের সীমা, জড়জগতই তাহাদের উন্নতি ও অবনতির রঙ্গভুমি। জড়জগতই তাহাদের কার্য্যস্থল। ইহারা জড়বাদী, ইহারা অজ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে অনেক লোক এরূপ আছে যাহারা বাহ্যিক শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং তাহাদিগকে সচরাচর আমরা শিক্ষিত ও পণ্ডিত নামে অভিহিত করিয়া থাকি কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহারা প্রকৃত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত; তাহারা মূর্খ। যে জ্ঞানে মানুষের মনুষ্যত্ব আনয়ন করে; যে জ্ঞানে মানব জ্ঞানমার্গে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারে সেই শ্রেষ্ঠজ্ঞান তাহাদের হৃদয় আলোকিত করিতেছে না ও তাহাদের ধীশক্তিকে নিষ্কাম কর্ম্মমার্গে প্রেরণ করে না। এই সকল লোক আত্মায় অবিশ্বাসী। পরমাত্মার জ্ঞান ইহাদের নাই অতএব ইহাদিগকে আত্মঘাতী নামে অভিহিত করা যায়। এই সকল দৈহিক সুখপরায়ণ লোক আত্মাকে হত্যাই করিতেছেন বুঝিতে হইবে। আত্মা তাহাদের পক্ষে মৃত, আত্মা যদি তাহাদের জীবিত থাকিত তাহা হইলে তাহারা তৎসম্বন্ধে এরূপ ঔদাসিন্য অবলম্বন করিতে পারিত না। আত্মা সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত কিন্তু যাহারা তাহা ভুলিয়া যায় বা তৎপ্রতি অমনোযোগী হয় আত্মা স্বীয় আলোকে তাহাদের বুদ্ধি উজ্জ্বলিত করেন না। তাহাদের হৃদয় ধর্ম্মালোক হইতে বঞ্চিত এবং তাহারা অনায়াসেই কু-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ লোক অন্ধকারাচ্ছন্ন অসুরলোকে গমন করে।

আত্মঘাতী লোক দুই প্রকারের। প্রথম, যাহারা সদাই কুকর্ম্মে রত তাহারা ঈশ্বরে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে তাহারা কখন কুকর্ম্ম করিতে পারে না। তাহারা নিজ স্বার্থলাভের জন্য অপর মানব প্রতি অত্যাচার করে এবং তাহাদিগের অনিষ্ঠ করে এইরূপ লোক প্রথম শ্রেণীর আত্মঘাতী। সকল মানবের হৃদয়েই পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন; সকল মানবই পরমেশ্বরের প্রিয় সুতরাং কোন মানবের অনিষ্ঠ করিলেই পরমেশ্বরের অপ্রিয়কার্য্য করা হইল। সুতরাং এইরূপ লোককে আত্মঘাতী বলা হয়। ইহারা পাশব বৃত্তিসম্পন্ন ইহাদের অন্তঃকরণে দেবভাব বা ধর্ম্মভাব আদৌ নাই। ইহাদিগকে আসুরিক মানব বলা যাইতে পারে। এই প্রথম শ্রেণীর আত্মঘাতীগণের অন্তঃকরণ ও মন্দ, বাহ্যিক কর্ম্মও মন্দ। ইহারা ধর্ম্মদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী সুতরাং ইহারা সর্ব্বতোধিক আত্মঘাতী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মঘাতীগণ কুকর্ম্ম করে না বটে কিন্তু নিতান্ত স্বার্থপর এবং কোন ভালকর্ম্ম করে না। কেবল নিজের স্বার্থ, নিজের শারীরিক সুখভোগ লইয়াই ব্যস্ত পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরের আধার মানবের কোনরূপ উপকার বা লাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করে না। এরূপ লোক যদিচ সমাজের পক্ষে একেবারে মন্দ নহে কিন্তু তাহারাও সমাজের ক্ষতিকারী। ঈশ্বর যে মানবকে অর্থ ও ক্ষমতা ও অধিকার দিয়াছেন তাহার কর্ত্তব্য সেই সকলের সদ্ব্যবহার করা অর্থাৎ যাহার দুঃখ আছে তাহার দুঃখমোচন করা যাহার অভাব আছে তাহার অভাব মোচন করা, যে ব্যক্তি তাহা করেনা সে আত্মদ্রোহী সে পরমাত্মা পরমেশ্বরের বিরোধী। সে পরমাত্মার আদেশ গ্রাহ্য করে না তাঁহাতে তাহার বিশ্বাস নাই। তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করে না কিম্বা মৌখিক স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাকে অস্বীকার বা অবমাননা করে। সুতরাং তাহারাও আত্মদ্রোহী বা আত্মঘাতী।

ঐরূপ আত্মঘাতী লোক মৃত্যুর পর অন্ধকারাবৃত নিরানন্দময় অসুরলোকে গমন করে।

হিন্দুশাস্ত্রে অসুর নামে একশ্রেণীর জীবের উল্লেখ আছে। ইহারা দেবতা-দিগের বিরোধী। পুরাণে দেবাসুরের চিরকালব্যাপী যুদ্ধের বর্ণনা অনেক আছে।

অসুর।

এই যুদ্ধে অধিকাংশ সময়েই অসুরগণই জয়লাভ করিয়া থাকিত এবং দেবতাগণ পরাজিত হইয়া স্বর্গত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন এবং সর্ব্বতোভাবে লাঞ্ছিত ও যথেষ্ট কষ্টপ্রাপ্ত হইতেন।

যাঁহারা এই দেবাসুর যুদ্ধের অর্থ বুঝেন না তাঁহারা এই সকল বিবরণ বালকোপযোগী উপকথা মনে করিতে পারেন। ইহার প্রকৃত গূঢ় অর্থ আছে। তাহা শাস্ত্রের সকল গূঢ়তত্ত্বের ন্যায় ধ্যানগম্য। অতএব এই বিষয়ের আলোচনা হইতে আমরা বিরত রহিলাম।

শাস্ত্রে অসুরের বর্ণনা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে যাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই যাহারা সৎকর্ম্ম করে না ও সৎকর্ম্মীর বিরোধী; যাহারা মনুষ্য দ্বারা যজ্ঞাদি শাস্ত্র বিহিত পুণ্যকর্ম্ম করণে বিঘ্ন প্রদানের চেষ্টা করে তাহারাই অসুর। ইহারা অসৎ কর্ম্মী ও সৎকর্ম্ম বিরোধী। ইহারা যে স্থানে বাস করে তাহার নাম অসুরলোক। যাহারা পৃথিবীতে জীবদ্দশায় কেবল জীবন ধারণ, পান ভোজন ও শারীরিক অপর বৈধ ও অবৈধ সুখভোগে রত ছিল অর্থাৎ যাহাদিগকে উপরে আত্মঘাতী বলা হইয়াছে তাহারাই মৃত্যুর পর অসুরত্ব প্রাপ্ত হয় ও অসুরলোকে গমন করে এবং তথায় বাস করে।

শাস্ত্রকারেরা বলেন এই দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সপ্তলোকের। ইহার একলোককে ভূর্লোক বলে, আর ছয়টী লোক ইহা হইতে পৃথক স্থানে অবস্থিত নহে; ইহারই সহিত একস্থানে সংশ্লিষ্ট ভাবে স্থিত তবে উহারা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর নহে। আমরা স্থূলদেহী, আমরা স্থূল ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট অতএব আমরা কেবল স্থূলদেহযুক্ত ভূর্লোকই দেখিতে পাই উহাই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর এবং উহাতেই আমরা বাস করি। আমরা এই স্থলে তিনটী লোকের কেবল কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। অপর ৪টী আমাদের বর্ত্তমান চর্চ্চার বিষয় নহে। এই তিনটী লোকের নাম ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্গ অথবা নরলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। লোক অর্থে যাহা দেখা যায় এবং যথায় সুখ দুঃখ ভোগ করা যায়; অতএব লোক অর্থে আবাস স্থান হইতেছে। মানব জীবদ্দশায় ভূর্লোক বা নরলোকে বাস করে; মৃত্যুর সময় তাহার প্রাণবায়ু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ মহা বায়ুতে মিলিত হয়। জীবের প্রাণ স্থূলদেহ হইতে বহির্ভূত হইয়া বিশ্বপ্রাণে সংযুক্ত হয়। স্থূলদেহ প্রাণত্যক্ত হইয়া কালক্রমে গলিত হইয়া অথবা অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া ক্ষিতি ও অপে পরিণত হয়. শরীরস্থ বায়ু অগ্নি ও আকাশ জাগতিক বায়ু তেজ ও ব্যোমে মিলিত হয়। জীবাত্মা স্থূলদেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া সূক্ষ্মদেহ ও কারণ-দেহ লইয়া প্রেতলোকে গমন করেন। এই প্রেতলোক সপ্ত অংশে বিভক্ত তন্মধ্যে সর্ব্ব নিকৃষ্ট অংশকে অসুরলোক বলা যায়। ইহা অন্ধকারময় ও নিরানন্দ স্থান; এখানে যাহারা বাস করে তাহারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। ইহাকে

অসুরলোক।

নরক বলা যাইতে পারে। কারণ মানব তাহার পাপের শাস্তি কতকটা এইখানেই প্রাপ্ত হয় বাকী শাস্তি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রাপ্ত হয়। নরক বলিয়া কোন স্থান যেখানে বাহ্য হইতে পাপীর প্রতি উৎপীড়ন হয় তাহা নাই। অসুরলোকে পাপাত্মা অসুর যে কিছু শাস্তি পায় তাহা নিজের অন্তর হইতে পায়, যমদূত আসিয়া ডাঙ্গস মারে না বা মলের কূপে ডুবাইয়া রাখে না। উহা আন্তরিক শাস্তির অতি রঞ্জিত অলঙ্কার মাত্র।

আসুরিক মানব জীবদ্দশায় কেবল আহার বিহার পান ভোগ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত থাকায় উহাদের ইন্দ্রিয় সুখলিপ্সা এত প্রবল হয় যে তাহারা উহা ব্যতীত থাকিতে পরে না। পার্থিব সুখেচ্ছা মৃত্যুর পরও বলবতী থাকে কিন্তু স্থূলদেহের ও ইন্দ্রিয়বিষয়ের অভাবে ঐ ইচ্ছা তৃপ্ত করিতে পারে না সুতরাং তজ্জন্য নিতান্ত কষ্টভোগ করে। ইহাই অসুরদিগের শাস্তি এবং ঐ নরকই উহাদের ভোগ করিতে হয়। আত্মঘাতী ব্যক্তি মরণান্তে অসুরত্ব প্রাপ্ত হইয়া অসুরলোকে বাস করে ও অসুর ভোগ্য শাস্তি ভোগ করে। ঐরূপ শাস্তিভোগ দ্বারা তাহারা বুঝিতে পারে যে ইন্দ্রিয় সুখ সকল অনর্থজনক ও কষ্টকর এবং কেহ কেহ প্রতিজ্ঞা করে আর এরূপ কার্য্য করিবে না। বহুকাল এইরূপে কাটাইয়া পাপ ক্ষীণ হইলে নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পুনর্জন্মের পর অনেকে ঐ সব ভুলিয়া যায়, কেহ কেহ ঐ প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারে।

অতএব উপনিষদের উপদেশ এই যে মানব তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা কর।

আত্মা কি তাহা নিম্ন দুইটী শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে, উহা পাঠ করিয়া উহার অর্থ সম্যক বুঝিতে চেষ্টা করিবে। দীর্ঘকালব্যাপী ধ্যান দ্বারা প্রত্যেক মন্ত্রটীর অর্থের সম্যক উপলব্ধি হইবে।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪॥
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥৫॥

শাস্ত্রে পরমেশ্বরের যে সকল বর্ণনা আছে তাহা পাঠের পূর্ব্বে আমাদের মনে করা আবশ্যক পরমেশ্বর নির্গুণ আমরা সগুণ; তিনি নির্ব্বিকল্প ও নির্ব্বিকার আমাদের মন সবিকল্প ও সবিকার। আমাদের মত মানবের পক্ষে পরমাত্মা পরমেশ্বর কল্পনাতীত, অচিন্তনীয় ও অনির্ব্বচনীয়। যাহা আমরা কল্পনা করিতে

পারি, যাহা আমরা চিন্তা করিতে পারি তাহাই আমরা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি। যিনি আমাদের মনের অতীত তাঁহাকে আমরা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিব কিরূপে। অতএব শাস্ত্রে পরমাত্মা পরব্রহ্মের যে কিছু বর্ণনা আছে তাহা তাঁহার সঠিক বর্ণনা নহে, তাহার দ্বারা তাঁহার প্রকৃত উপলব্ধি আমাদের হইতে পারে না; তিনি অতুলনীয় অতএব মনুষ্য তাঁহাকে সীমাবদ্ধ বুদ্ধির সীমার অভ্যন্তরে আনয়ন জন্য নিজবোধগম্য তুলনার দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। নির্গুণকে সগুণ উপমা দ্বারা বুঝা ভিন্ন মানবের পক্ষে অপর উপায় নাই। সুতরাং শাস্ত্রকার ঋষিগণ এই প্রথা অবলম্বনে পরমাত্মা কি তাহা সাধারণ মানবকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই দুইটী শ্লোকস্থ মন্ত্রগুলি কেবল পাঠ করিলে ও উহার অর্থবোধ হইলেই যথেষ্ট নহে উহা কেবল মৌখিক জ্ঞান, মন্ত্রগুলি এক মনে ধ্যান করিতে হইবে এইরূপে ক্রমশঃ জন্মজন্মান্তর তাঁহার উপাসনা করিলে তবে মানব প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে এবং তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে।

প্রাণীর সহজ-লক্ষ্যগুণগুলির মধ্যে গতি বল ও আয়তন প্রধান। এই শ্লোকে পরমাত্মাতে এইগুণগুলি আছে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। যদিচ বেগবত্তা প্রাণীর একটী শ্রেষ্ঠগুণ তাহা হইলেও পরমেশ্বরকে একপক্ষ হইতে দৃষ্টি করিলে তাঁহার গতি নাই; তিনি অনেজং নিস্পন্দ নিশ্চল। তিনি একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করেন না; সুতরাং গতিহীন। যিনি সদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন তিনি একস্থান হইতে অপর স্থানে কিরূপে গমন করিবেন। এমন কোন স্থান নাই যথায় তিনি অবিদ্যমান; সুতরাং তাঁহাকে কোনস্থানে গমন করিতে হয় না অতএব এইশ্লোকে প্রথমেই তাঁহাকে গতিহীন বলা হইয়াছে।

অনেজৎ।

জীব পরিবর্ত্তনশীল; তাহার পরিবর্ত্তন অতি অবশ্যই ক্রমাগত হইতেছে। কিন্তু পরমাত্মা একভাবেই সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিতেছেন অতএব তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একরূপে বর্ত্তমান এজন্য তাহাকে এক বলা হইয়াছে।

একং।

যদিচ পরমাত্মা গতিহীন তথাচ অপরপক্ষে তিনি অতি বেগবান এমন কি মন হইতে অধিকতর বেগবান্। পরমেশ্বরের গতি না থাকিলেও তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেগবান ইহার অর্থ এই যে তিনি সদাসর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে একস্থান হইতে অারস্থানে যাইতে হয় না; তুমি যে স্থানেই যাওনা কেন দেখিতে পাইবে

মনসো জবীয়ঃ।

তোমার পূর্ব্বেই তিনি তথায় উপস্থিত আছেন। মানবের মন সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী; এক্ষণে আমার মন পাটনায় আছে কিন্তু পরক্ষণেই উহা কলিকাতা অথবা বোম্বাই বা লণ্ডনে কল্পনাবলে যাইতে পারে এরূপ বেগ কোন প্রাণীর বা কোন দ্রুতগতি যানের নাই। অতএব অপর বেগবান দ্রব্য বা বলের অপেক্ষা মন অধিকতর দ্রুতগামী। এই মন্ত্রে বলা হইতেছে যে পরমেশ্বর মন হইতেও অধিকতর বেগবান। কারণ মনকেও কল্পনা করিতে কিছুক্ষণ সময় লাগে কিন্তু পরমেশ্বরের পক্ষে সে অল্প সময়েরও প্রয়োজন নাই তিনি পূর্ব্ব হইতেই তথায় বিরাজ করিতেছেন, অর্থাৎ তিনি বিভু, সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

ইনি অগ্রগামী হইলে মানবের ইন্দ্রিয়গণ ইঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। এইস্থলে ইন্দ্রিয়গণকে দেবতা বলা হইয়াছে। মানবের দশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চ

নৈনদ্দেবাঁ আপ্নুবন পূর্ব্বমর্ষৎ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, যথা—হস্ত, পদ, বাক্য, উপস্থ, পায়ু। মনুষ্যগণ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান আহরণ করে। আমরা যে কিছু বাহ্যিক জগতের জ্ঞানলাভ করি তাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা; দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা আমরা বাহ্যবস্তুর সহিত মনঃসংযোগ করি এবং তাহার স্বরূপ অবগত হই।

ইন্দ্রিয়গণকে দেবতা কেন বলা হইল ইহা প্রশ্ন হইতে পারে—দ্যোতনাৎ দেবাঃ অর্থাৎ যাঁহারা প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় দেবতাগণের উপাসনাদ্বারা আমরা ক্রমে

দেবতা।

পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারি অতএব তাঁহারা দেবতা নামে অভিহিত হন। মানবের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বিশ্বসংসারে পরমেশ্বরের পার্থিব ক্রিয়া মানব চিত্তসকাশে প্রকাশ করে অতএব ইন্দ্রিয়গণকেও দেবতা বলা হইয়াছে।

"মনসো জবীয়ঃ" ও নৈনদ্দেবা আপ্নুবন পূর্ব্বমর্ষৎ" এই দুইটী মন্ত্রের একভাবে এই অর্থ হইতে পারে যে পরমাত্মা পরমেশ্বর ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর।

তিনি স্থির থাকিলেও অন্যেরা ধাবমান হইয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অন্য বস্তু বা প্রাণী যতই কেন দ্রুতগামী হউক না তাঁহাকে অতিক্রম করিতে

তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ।

পারে না অর্থাৎ এমন কোন স্থানে যাইতে পারে না যেখানে তিনি নাই। মানবের মন বা ইন্দ্রিয় এরূপ স্থানে গমন করিতে পারে না যেখানে তিনি বিরাজ করেন না। অতএব তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান আছেন। এককথা বারম্বার বলার প্রয়োজন এই যে পুনঃ পুনঃ এই মন্ত্রগুলি চিন্তা করিতে ও একমনে ধ্যান করিতে হইবে।

মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতি ইতি মাতরিশ্বা অর্থাৎ যিনি অন্তরীক্ষে যাতায়াত করেন। ইহার দুইটী অর্থ, বায়ু ও হিরণ্য গর্ভ ব্রহ্মা। অপঃ অর্থে কর্ম্ম বা কর্ম্ম ফল; তাঁহাকে অর্থাৎ নিত্য চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্মকে, আশ্রয় করিয়া বায়ু প্রাণিগণের প্রাণধারণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। বায়ু সকল প্রাণীর প্রাণের আশ্রয় স্থান; বায়ুর সাহায্যে মানব জীবিত থাকিয়া ধাবন দণ্ডায়ন বাক্য কথন নিশ্বাস প্রশ্বাস বহন প্রভৃতি সমস্ত প্রাণ কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছে; বায়ু না থাকিলে এ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত না। অতএব বায়ু জীব জগতের একান্ত আবশ্যকীয় পদার্থ এবং এই বায়ুর আশ্রয় স্থান তিনিই—সেই পরব্রহ্ম। ইহার দ্বিতীয় অর্থ এই যে—পরমাত্মা যখন বিশ্ব সৃষ্টির মানস করেন তখন তাঁহা হইতে কার্য্যশক্তি আবির্ভাব হয়, ইহাঁরই নাম হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্য ব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্ম। এই হিরণ্যগর্ভ অন্তরীক্ষে বাস করেন; ইনিই বিশ্ববিধাতা সূত্রাত্মা তিনি প্রাণিগণকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করান, কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন, ও কর্ম্মফল ভোগ করান। অতএব এই মন্ত্র দ্বারা কথিত হইতেছে যে বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্য ও প্রাণিদিগের রক্ষণ কার্য্য সম্পাদনকারী অন্তরীক্ষ নিবাসী বিধাতার তিনিই আশ্রয়।

তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।

পঞ্চম শ্লোকে বলা হইতেছে তিনি গতিহীন হইয়াও গতিশীল বলিয়া প্রতীত হন. তিনি দূরেও আছেন নিকটেও আছেন তিনি সকল পদার্থের ভিতরেও আছেন বাহিরেও আছেন। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি সচল ও নিশ্চল; এই দুইটী কথা অসংলগ্ন ও পরস্পর বিরোধী; পরমাত্মার প্রতি এরূপ গুণারোপ কেন করা হইয়াছে? এই বাক্যগুলি সাধারণ পাঠকের পক্ষে বালকোপযোগী অসঙ্গত ও যুক্তিহীন মনে হইতে পারে। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন যে পরমাত্মা পরমেশ্বর জ্ঞানের ও যুক্তির অগোচর, দ্রব্য বা জীবের যে কিছু গুণের পরিচয় আমাদের আছে, তিনি সেই সকল গুণের অতীত এবং সেই সকল গুণ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত এবং তাঁহাতেই সমাবিষ্ট। তাঁহা সম্বন্ধে এ সকল বাক্য অসংলগ্ন মনে হইলেও অসংলগ্ন নহে এবং পরস্পর বিরোধী গুণ সকল তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয় ও তাঁহাতেই স্থিত আছে ও পরে প্রলয় কালে তাঁহাতেই অন্তর্হিত হইবে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে পরমাত্মা পরমেশ্বরের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেকের পক্ষে দুরূহ মনে হইতে পারে এবং এরূপ ব্যক্তি মনে করিতে পারেন ইহাঁর সম্যক উপলব্ধির চেষ্টা করা বৃথা উহাতে কোন ফল লাভ হইবে না। এতদ্ব্যতীত বিষয়াসক্ত লোক মনে করিতে পারেন ইহাতে পারলৌকিক লাভ

হইবে কিনা কে জানে কোন পার্থিব লাভের সম্ভাবনা যখন নাই তখন এই বিষয় লইয়া বৃথা আলোচনার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে নিম্নের দুইটী শ্লোক রচিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান কেবল পারত্রিক সুখের জন্য নহে ইহলোকেও উহার উপকারিতা আছে তাহাই দেখান হইতেছে। নিম্নের শ্লোকদ্বয়ে পরমাত্মার বর্ণন ও হইয়াছে এবং আত্মজ্ঞানের ঐহিক লাভ ও বিবৃত হইয়াছে।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততোন বিজুগুপ্সতে ॥৬॥
যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥৭॥

যিনি সর্ব্বভূত পরমাত্মা পরমেশ্বরে অবস্থিত এবং সর্ব্বভূতে পরমাত্মা বিদ্যমান ইহা দর্শন করেন অর্থাৎ জানেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

সর্ব্বভূতে পরমেশ্বর দর্শন দ্বারা যখন জ্ঞানী ব্যক্তির সমগ্র জীবে একত্ব জ্ঞান লাভ হয় তখন তাঁহার মোহই বা কি এবং শোকই বা কি? অর্থাৎ শোক মোহ থাকে না।

পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরেও আছেন বাহিরেও আছেন। এই সত্যের সম্যক উপলব্ধির পার্থিব লাভ এই শ্লোক দুইটীতে বিবৃত হইল। মানব সাধারণতই দম্ভশালী আমি, তুমি, সে, এই ভেদজ্ঞান বর্ত্তমান মানবের হৃদয় অভিভূত রাখিয়াছে, এবং তজ্জন্য আমি শ্রেষ্ঠ, তুমি নিকৃষ্ট, আমি ভাল, তুমি অথবা সে মন্দ, আমি বুদ্ধিমান বা বলবান, তুমি অথবা সে নির্ব্বোধ বা দুর্ব্বল, এই অহঙ্কার দ্বারা অনবরত চালিত হইয়া মানব পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিতেছে। এই ভেদ জ্ঞানই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের মূল কারণ। এই ভেদজ্ঞান না থাকিলে মনুষ্য ষড়রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া অশেষবিধ দুঃখজনক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত না। এই ভেদজ্ঞান থাকায় মনুষ্য মনুষ্যকে ঘৃণা করে, দুঃখ দেয় ও নানাবিধরূপে উৎপীড়ন করে, কিন্তু যাঁহার এই ভেদজ্ঞান নাই তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, তিনি সকলকেই পরমাত্মার অংশ জানিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন।

যিনি প্রকৃত ঈশ্বর ভক্ত যাঁহার ভক্তি কেবল লোক দেখান বা মৌখিক নহে তিনি জানেন মনুষ্য কেন সকল জীবই পরমেশ্বরের সন্তান; পাপীর হৃদয়েও তিনি আছেন এবং পুণ্যবানের অন্তরেও তিনি বর্ত্তমান। তাঁহা ব্যতীত এ বিশ্বজগতে কোন প্রাণী বা পদার্থ নাই ও থাকিতে পারে না; অতএব কোন প্রাণীর প্রতি দ্বেষ করিলে তাঁহার প্রতি দ্বেষ করা হইল, এই জ্ঞান যাঁহার আছে তিনি কিরূপে কোন প্রাণীকে ঘৃণা করিবেন?

ষষ্ঠ শ্লোকে উপনিষদ শিক্ষা দিতেছেন যে সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দেখিতে পাইলে অপর মানবের প্রতি ঘৃণা হৃদয়ে আর স্থান পাইবে না। প্রকৃত পরমার্থজ্ঞান হইলে আমরা বিশ্বপ্রেমিক হইব। আমি যদি কেবল স্বকীয় শারীরিক ও বৈষয়িক সুখভোগ লইয়া ব্যস্ত থাকি, অপরের সুখ দুঃখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করি আমার হৃদয় স্বার্থপর হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমি যদি নিজের বাহ্যিক সুখে অনাস্থাবান হইয়া পরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখমোচনের চেষ্টা করি তাহা হইলে আমার অন্তঃকরণে পরপ্রেম ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে এবং এইরূপে জন্ম জন্মান্তর পর সেবা করিতে করিতে আমি প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক হইব। এই বিশ্বপ্রেম হইতে আত্মজ্ঞান জন্মিবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, পাপীর প্রতি ঘৃণা না করিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে তাহাতে পাপের আরও বৃদ্ধি হইবে। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে পাপের প্রতি বিদ্বেষ ও পাপীর প্রতি ঘৃণা এই দুইটী পৃথক্। পাপের প্রতি ঘৃণা আমাদের সকলেরই অন্তঃকরণে থাকা কর্ত্তব্য তাহা না থাকিলে সাধারণ মানবের পাপ পথে পতিত হওয়া অতি সহজেই হইতে পারিবে কিন্তু পাপীর প্রতি ঘৃণা করিবে না। পাপী পাপ কেন করে? অজ্ঞানতা-বশতঃ ও পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ষড়রিপুর প্রবলতা জন্য। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই ষড়রিপু আমাদিগকে পাপে প্রবর্ত্তিত করায়; যাহারা এই রিপুগণকে দমন করিতে শিক্ষা করে নাই তাহারা উহাদের বশবর্ত্তী হইয়া পাপাচরণ করে। আমরাও কোন না কোন পূর্ব্বজন্মে কোন না কোন রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া পাপকার্য্য করিয়াছি এই ভাবিয়া পাপীকে ঘৃণা করিবে না; যথাসাধ্য তাহাকে শোধরাইবার চেষ্টা করিবে। ইহাই ঈশ্বর ভক্তের কর্ত্তব্য।

বিশ্বপ্রেম।

তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে যেমন অপর মানবের প্রতি ঘৃণা থাকে না সেইরূপ উহার শোক মোহ ও থাকে না ইহাই সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে।

একমেবাদ্বিতীয়ং এই সর্ব্বোচ্চ সত্য শিক্ষা দেওয়াই উপনিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সত্যই নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে উপনিষদ ক্রমাগত শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বসংসারে এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই; এই যে অসংখ্য প্রকাশতঃ নানা বস্তু দেখিতেছি ইহা অজ্ঞানীর চক্ষে বিভিন্ন বোধ হইলেও ইহা পৃথক নহে; ইহা সকলই তিনি—সেই একই বস্তু। তিনি সর্ব্বভূতে ও সর্ব্ব দ্রব্যে আছেন এবং সর্ব্বভূত ও সর্ব্বদ্রব্য তাঁহাতে আছে। দ্বিতীয় পদার্থ বা ভূত বা শক্তি কিছুই নাই। সাধারণ মানবের এই

একমেবাদ্বিতীয়ং।

একত্বজ্ঞান নাই ; সে অনবরত আমি আমার লইয়াই ব্যস্ত। আপনাকে অপর হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া কেবল এই ভিন্নজীবের বৈষয়িক উন্নতি ও ঐহিক সুখের জন্য লালায়িত।

মোহ।

এইরূপ মানবের হৃদয় মায়াচ্ছন্ন। আমার সুখ, আমার ক্ষমতা, আমার অর্থ, আমার যশ কিসে হইবে এই বিষয়েই সে ব্যাপৃত। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা এইরূপ ভাবিয়া সে আপন পরিবারস্থ লোককে ভালবাসে অন্য ব্যক্তি পর তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই এই ভাবিয়া অন্যের প্রতি অনাস্থাবান হয়। ইহাই মোহ।

কতকগুলি প্রাণী অতীত কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকা প্রযুক্ত বর্ত্তমান জীবনে এক পরিবার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বা একস্থানে বাস করিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে বলিয়াই তাহারা আপনার ও অন্য ব্যক্তি পর এইরূপ মনে করা অত্যন্ত ভ্রম। যাহারা আমার সহিত কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত থাকায় আমার পরিবার ভুক্ত, তাহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে সত্য, সে কর্ত্তব্য আমার সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতার সেবা করা একান্ত করণীয়, পুত্রাদির লালন পালন ও শিক্ষাদান আমার উচিৎ, কিন্তু আমার ইহাও জানা আবশ্যক যে এই সকল কার্য্য দ্বারা আমি কেবল পূর্ব্বজন্মকৃত ঋণ শোধ করিতেছি। যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আমার হিতসাধন করিয়াছেন তাহার প্রতিদান আমাকে এজন্মে করিতে হইতেছে। এই সকল ঋণ শোধ কার্য্যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া মানবের অবশ্য করণীয় অপর কর্ম্ম ত্যাগ সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। সমুদয় বিশ্বসংসার এবং সমগ্র জগতের কার্য্য জন্য আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি সমস্ত বিশ্বের উন্নতি কল্পে আমার যথাসাধ্য যত্ন করা উচিত, ইহা ভুলিলে চলিবে না। পরিবারবর্গ বিশ্বের একাংশ মাত্র, এই ক্ষুদ্রাংশের প্রতি কায়মনোবাক্য সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া অপর বৃহৎ বৃহৎ কর্ত্তব্যে অবহেলা করাই মোহ। অপরকে দমন করিয়া অপরের ক্ষতি করিয়া কেবল স্বকীয় ধন, ক্ষমতা, যশ লইয়া বিব্রত থাকাই মোহ। যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে তিনি জানেন স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ কেহই তাঁহার নহে। নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ জন্য আমার সংশ্রবে তাহারা আসিয়াছে, কর্ম্ম শেষ হইলেই আমার মুখাপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া যাইবে, কোন মতেই তাহাদের আমার নিকট রাখিতে পারিব না। অতএব কেন আমার আমার ভাবিয়া চিরজীবন মুগ্ধ থাকি।

আমার স্ত্রী অথবা সন্তান বিয়োগে আমি নিতান্ত শোকে অভিভূত হই কিন্তু ইহা ভাবি না যে উহার সময় হওয়াতে, আমার সহিত যে কর্ম্মবন্ধ ছিল তাহা

আপাততঃ সম্পন্ন হওয়াতে সে অপর ক্ষেত্রে কর্ম্ম-সাধন জন্য চলিয়া গেল, সুতরাং তজ্জন্য শোক করা বৃথা ও নিষ্প্রয়োজন। আমারও যখন সময় আসিবে আমিও এই মর্ত্ত্যদেশ ছাড়িয়া যাইব। তবে কেন বৃথা শোক করি। শোক মোহ হইতে উৎপন্ন হয়; মোহ না থাকিলে শোক হয় না। ইহলোক সুখের স্থান মনে করিয়া আমরা মরণকে ভয় করি, ইহাও আমরা মোহবশতই করি। অতএব যাহাতে সকল দুঃখের কারণ মোহ দূরীকরণ জন্য আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শোক।

এক্ষণে কিরূপে সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিতে পারা যায় তাহা দেখা যাউক। পুনরুক্তি দোষ হইলেও পুনঃ পুনঃ এ বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। উপনিষদ যে সকল সত্য শিক্ষা দেন তাহা কেবল কর্ণে শুনিলে বা অর্থ বুঝিলে তাহার সম্যক উপলব্ধি হইল না। তাহার সম্যক ধারণা হওয়া চাই—তাহা কার্য্যে পর্য্যবসিত করা চাই। আমরা আসক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কায়মনোবাক্য-দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করি তাহা উপনিষদ নিহিত সত্য দ্বারা চালিত যাহাতে হয় তাহা করা প্রয়োজন। আমরা এ অবস্থায় উপনীত হইতে গেলে চেষ্টা ও অভ্যাস আবশ্যক। যাহার যেরূপ ভাবনা তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ। কোন সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের শাস্ত্রকারগণ জপ করিতে বলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উপনিষদের এক একটী শ্লোক বা শ্লোকাংশ মন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মন্ত্র সকলের এক মনে ধ্যান করিতে করিতে মানবের হৃদয়ে উহা প্রোথিত হইবে এবং তাহার সমুদয় কর্ম্ম মন্ত্রাদিষ্ট পথ অবলম্বন করিবে। ইহাতে বহু আয়াস ও বহু কাল ব্যাপী অভ্যাসের প্রয়োজন সত্য কিন্তু জীবনও অসীম। আমরা অনন্তকাল জন্মের পর জন্মগ্রহণ করিতেছি ও করিব, এ জীবনে যাহা আরম্ভ করি তাহার কোন বৃহৎ কার্য্যই এ জীবনে সম্পন্ন হয় না বা হইবার নহে। জন্ম জন্মান্তর চেষ্টা করিয়া ভবিষ্যত কোন জীবনে তাহা সিদ্ধ হইবেই হইবে; কেবল কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা চাই। এ উপনিষদ ভাণ্ডার হইতে একটী মন্ত্র যাহা ভাল লাগে তাহা লইয়া একমনে প্রত্যহ প্রাতঃকালে দৈনিক কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে অন্ততঃ কিছুক্ষণ জপ করিতে হইবে। এইরূপে ঐ মন্ত্রটী অনেক দিন পর্য্যন্ত ধ্যান করার পর উহা হৃদয়ে গ্রথিত হইবে তখন অপর একটী লইয়া পুনরায় ঐরূপ জপ আরম্ভ করিবে। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। শোক মোহের হস্ত এড়াইতে হইলে এই পথাবলম্বন ভিন্ন অপর মার্গ নাই।

নিম্নের শ্লোকে পুনরায় আত্মার বর্ণন হইয়াছে :—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮॥

সেই পরমাত্মা সর্ব্বদিগ্ব্যাপী, তিনি জ্যোতিষ্মৎ, তিনি অকায়, তিনি অক্ষত, নির্ম্মল, স্থূল শরীর বর্জ্জিত, পাপ পুণ্য হীন, সর্ব্বদর্শী, মনের প্রভু, সর্ব্বোপরি বিরাজমান এবং স্বয়ম্ভু। তিনি প্রজাপতিগণকে নিত্য যথাযুক্ত স্বকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বস্থানেই আছেন। আকাশ যেরূপ সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান তিনিও সেইরূপ সর্ব্বস্থানেই বিরাজ করিতেছেন। এরূপ স্থান বিশ্বসংসারে নাই যেখানে তিনি নাই। সকল বস্তু ও প্রাণী ও শক্তির মধ্যে ও বাহিরে তিনি আছেন। সকল বস্তুই ও সকল প্রাণীই তাঁহাতে আছে ও তিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্ব পদার্থে আছেন।

সপর্য্যগাৎ।

তিনি শুক্র অর্থাৎ শুদ্ধ অতএব জ্যোতিষ্মৎ। সূর্য্য ও তারকাদি তাঁহা হইতেই জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ব সংসারকে আলোকিত করিতেছে। তাঁহার দীপ্তিই উহাদিগকে দীপ্তিমান করিয়াছে সুতরাং তিনি স্বয়ং দীপ্তিমান।

তিনি সর্ব্ব জগতের শরীর স্রষ্টা; সর্ব্ব পদার্থের দেহ বিধান করিয়াছেন কিন্তু স্বয়ং অশরীরী। তিনি স্থূলদেহ বিবর্জ্জিত। তিনি সর্ব্বদেহের মধ্যে আছেন; সমুদয় স্থূল পদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছেন কিন্তু সেই স্থূল দেহ তাঁহার নহে। সৃষ্টিকালে তিনি স্থূল দেহাদি ধারণ করিয়া জগৎলীলা সম্পাদন করেন; সৃষ্টি ও স্থিতির অন্তে প্রলয় কালে সেই স্থূলদেহ সম্বরণ করেন এবং সর্ব্বভূত যাহা এক্ষণে পৃথক পৃথক দেহ লইয়া জগতে প্রকাশিত তাহা তাঁহাতে লীন হয়। সর্ব্ব বিশ্বের স্থূলদেহ বিদেহী তাঁহাতে উপশমিত হয়।

অকায়।

আমাদের যে দেহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি তাহাই আমাদের স্থূল দেহ। এই দেহ অন্ন হইতে গঠিত এবং অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত ও পরিরক্ষিত এইজন্য ইহার অপর একটী নাম—অন্নময় কোষ। এই স্থূল দেহ সাধারণত রোগাক্রান্ত সুতরাং ক্ষতবিশিষ্ট। ইহাতে শিরা সকল বিদ্যমান; শিরা দ্বারা আমাদের শরীরে রক্ত চলাচল করিয়া

স্থূল শরীর।

শরীর রক্ষা করিতেছে। অক্ষত ও শিরাহীন দেহ নাই। অতএব অক্ষত অস্নাবির এই দুই শব্দের দ্বারা ইহাই বলা হইল যে পরমাত্মার স্থূল দেহ নাই। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে যদিচ তাঁহার স্থূল দেহ নাই তিনি সকল স্থূলশরীরে বর্ত্তমান আছেন। প্রকৃতপক্ষে স্থূল দেহ ময় সমগ্র জগৎ তাঁহারই দেহ কিন্তু ইহার সহিত তাঁহার অস্থায়ী সম্বন্ধ ইহা তাঁহার স্থায়ীভাব নহে, কিয়ৎকালের বিকার মাত্র। সৃষ্টির আরম্ভে তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া জগতলীলা সম্পাদন করেন এবং প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে এই সমগ্র বিশ্ব সংসার তাঁহাতেই উপশমিত হয় এসকল কিছুই থাকে না কেবল একমাত্র তিনিই থাকেন।

তিনি শুদ্ধ, নির্ম্মল অর্থাৎ অবিদ্যারূপ মলা তাঁহাতে নাই। অবিদ্যা অর্থে অজ্ঞানতা; ঈশ্বর জ্ঞানময়; তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সকল জ্ঞানই তাঁহা হইতে আবির্ভূত অতএব তাঁহাতে অজ্ঞানতারূপ মল থাকিবে কিরূপে।

শুদ্ধং।

শাস্ত্রে অনেক স্থলে জ্ঞান আলোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং অজ্ঞানতাকে অন্ধকার বলা হইয়াছে। আলোক যেরূপ জীবকে পার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যের স্বরূপ দর্শাইয়া দেয় এবং অন্ধকার জীবকে দেখিতে দেয় না তাহার চক্ষু আবৃত রাখে, জ্ঞানও সেইরূপ। জ্ঞানী মানব পাপ পুণ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন অজ্ঞানী তাহা পারে না, সুতরাং জ্ঞান আলোক, অজ্ঞানতা অন্ধকার। সেইরূপ আবার জ্ঞান নির্ম্মল অজ্ঞানতা মলাস্বরূপ। অজ্ঞানতাই মানবকে কুৎসিত কার্য্যে লিপ্ত করে তাহার মনের শুদ্ধত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট করে। আমরা যে কিছু পাপ করি তাহা অবিদ্যার উত্তেজনায়; যিনি পাপের কুফল বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন তিনি পাপকার্য্যে লিপ্ত হন না; যে ব্যক্তি উহা জানে না সেই পাপকর্ম্ম করে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে অনেক ব্যক্তি এরূপ আছেন যাঁহারা মন্দকর্ম্মের ফলাফল জ্ঞাত থাকিয়াও অনেক সময়ে পাপকার্য্য করে। বাস্তব পক্ষে ইহাদের জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে, উহা মৌখিক জ্ঞান। যে জ্ঞান কেবল কণ্ঠাগ্রে বিদ্যমান অথবা কর্ণাভ্যন্তরে মাত্র প্রবেশ করিয়াছে হৃদয়ে নিহিত হয় নাই, যাহা কার্য্যে পর্য্যবশিত হয় নাই, যাহা মানবের ষড়রিপুকে বশীভূত করিয়া মানবকে চালিত করে না তাহা বাহ্যিক জ্ঞান, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তাহা মানব মনকে স্পর্শ করিয়াও তাহাতে সংযুক্ত হয় না। সে জ্ঞান তাহার নহে। নদীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম স্পর্শ করিয়া নদীর জল অনবরত চলিতেছে, এই জল যতক্ষণ গ্রামবাসী উঠাইয়া লইয়া তাহাতে নিজ নিজ ক্ষেত্র সিঞ্চন না করে ততক্ষণ ঐ জল তাহার নহে, উহা হইতে গ্রামবাসীর কৃষিকার্য্যের কোন উন্নতি হইল না।

যে জ্ঞান আমার কর্ণ বাহিয়া চলিয়া গেল, যাহা দ্বারা আমার কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-রূপ বালুকাময় হৃদয়-মরুভূমি সিঞ্চিত হইল না তাহাতে আমার কি লাভ হইল? কি প্রয়োজন সাধিত হইল? সে ধন আমার নহে তাহা পরের।

পরমেশ্বর অপাপবিদ্ধ অর্থাৎ তিনি পাপ পুণ্য বর্জ্জিত তিনি পাপ ও পুণ্যের অতীত; তাঁহাকে পাপ বা পুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি উভয়ের অতীত।

অপাপবিদ্ধ।

তিনি কবি অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী; ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত নহে, তিনি মনীষী, মনের প্রভু। পরিভূ, সকল বস্তুর উপরে ও অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। স্বয়ম্ভূ—নিজেই আবির্ভূত হইয়াছেন, অপর কেহ তাঁহার জন্ম হেতু নহে।

কবি ইত্যাদি।

তিনিই কর্ম্মফল বিধাতা সম্বাখ্য প্রজাপতিগণকে যথাযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উবিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥
অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যু তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১১॥

এই তিনটী শ্লোকের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝিতে গেলে, বিদ্যা অবিদ্যা ও অমৃত এই তিনটী শব্দের অর্থ বুঝা চাই। ইহার সম্যক্ আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে অতএব আমরা সংক্ষেপে এই তিনটী শব্দের অর্থ আলোচনা করিব। আত্মজ্ঞান লাভের তিনটী মার্গ আছে, যথা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি। এই তিনটী মার্গ মধ্যে এক বা একাধিক মার্গের নিষ্কাম অনুসরণে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। সকাম অনুসরণে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। যাঁহাদের হৃদয় বৈরাগ্যবান যাঁহারা ত্যাগী তাঁহারাই কেবল আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম, অপরে নহে। ইহা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই বিবৃত হইয়াছে। নিষ্কাম ভাব বা নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ কিরূপে হইতে পারে তাহা দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই তিনটী শ্লোকে সকাম জ্ঞান বা বিদ্যা ও সকাম কর্ম্ম বা অবিদ্যাতে কি ফল তাহাই বিবৃত হইতেছে।

অবিদ্যা শব্দ শাস্ত্রে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু বিশেষ বিবেচনা দ্বারা বুঝা যায় যে ঐ শব্দের সকল অর্থেরই মূল একই ও সকল অর্থেরই অন্তরে একই ভাব নিহিত, উহা আত্মজ্ঞানের অভাব।

অবিদ্যা শব্দের প্রধান অর্থ মায়া বা মহামায়া। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই জগৎ ও যাবতীয় জাগতিক পদার্থ কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। কেবলমাত্র এক বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, পরমাত্মা, পরমেশ্বর বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জগৎ সৃষ্টির অভিপ্রায় করিলেন; এক আমি বহুধা হইব, বহু আকার ধারণ করিয়া জগৎলীলা আরম্ভ করিব। তাঁহার এই অভিপ্রায় এই বাসনাই মহামায়া নামে শাস্ত্রে অভিহিত। এই বাসনা হইতেই সমস্ত জগৎ উত্থিত, ইহাতেই স্থিত ও ভবিষ্যতে ইহাতেই উপশমিত হইবে। মহামায়া বা অবিদ্যা জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মাকে জগৎ দ্বারা আবৃত করিলেন সুতরাং পরমাত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেন এবং অস্থায়ী জগৎই স্থায়িরূপে প্রতিভাত হইল। অবিদ্যাই বিশ্বকে পরমাত্মা হইতে পৃথক বোধ করায় এজন্য ইহা তমোময়। মহামায়ার মায়াজালে আবৃত হইয়া মানব বাহ্যিক বিশ্বসংসারই দেখিতে পায় উহার অন্তরস্থ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে দেখিতে পায় না। এইরূপে মানবের মানস চক্ষু মায়াবদ্ধ থাকায় মানব কেবল জগতের বাহ্যিক আকারই দেখে এবং ঐ জগৎ স্থায়ী প্রকৃত ও সৎ বিবেচনায় জাগতিক ভোগেই মত্ত থাকে। এই ভোগ বাসনা মনুষ্যকে ক্রমশঃ স্বকীয় পার্থিব উন্নতির জন্য যত্নপরায়ণ করে ও পার্থিব সুখভোগে অভিভূত করে। ইহা মহামায়ারই কার্য্য অতএব এই পার্থিব ভোগ বাসনা ও পারমার্থিক চিন্তা বিষয়ে অমনোযোগিতাই অবিদ্যার দ্বিতীয় অর্থ। আমরা অবিদ্যা বা বিষয় বাসনা দ্বারা প্ররোচিত হইয়া যে সকল অজ্ঞানাত্মক কর্ম্ম করি তাহাও অবিদ্যা; এই শ্লোকত্রয়ে অবিদ্যা এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ অবিদ্যা অর্থে কর্ম্ম যাহা মানবকে আত্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত করে এবং লোভ মোহ দ্বারা উত্তেজিত করাইয়া স্বকীয় স্বার্থ লাভে যত্ন পরবশ করায়। অতএব অবিদ্যার তৃতীয় অর্থ অজ্ঞানাত্মক কর্ম্ম।

অবিদ্যা।

বিদ্যা অর্থে দেবতাজ্ঞান, উহা দেবোপাসনার ফল। পরমাত্মা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া দেবতাগণ পৃথক্ পৃথক্ বিশ্বপরিচালন কার্য্য করিতেছেন। সেই কার্য্যের জ্ঞান তাঁহাদের উপাসনা দ্বারা ঋষিগণ লাভ করিতেন। দেবতাগণ ঐশ্বরিক শক্তিমাত্র, তাঁহাদের উপাসনা দ্বারা তাঁহাদেরই শক্তি ও কার্য্যের জ্ঞান উদ্ভূত হয়। ঐ জ্ঞান জাগতিক জ্ঞান, উহা

বিদ্যা।

আত্মজ্ঞান হইতে পৃথক। ঈশোপনিষদে দেবতাজ্ঞান বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে ও আত্মজ্ঞান জ্ঞান নামে আখ্যাত হইয়াছে। দেবতাজ্ঞান সকাম উহা হইতে মানব নিজ মঙ্গল ও নানাবিধ উন্নতি প্রাপ্তির চেষ্টা করে। উহা আত্মজ্ঞান হইতে নিকৃষ্ট ফল প্রদান করে। বেদে নানাবিধ দেবতার বহুতর স্তুতিগান আছে ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে বেদ দেবোপাসনার উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু উহা সাধারণ মানবের পক্ষে। বেদের মন্ত্রগুলি দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিয়া মানবের স্বার্থ লাভের উপায় প্রদর্শন করিতেছে কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে বেদ আত্মজ্ঞানের সোপান; উহা প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানমার্গাবলম্বীকে আত্মজ্ঞান ও সাধারণ মানবকে দেবোপাসনা শিক্ষা দিয়া ভক্তিমার্গ অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিতেছে। জ্ঞানী দেবতাস্তুতির মধ্যে পরব্রহ্মের স্তুতি দর্শন করেন; কারণ দেবতাগণ পরব্রহ্মেরই অংশ, তাঁহারা তাঁহারই দ্বারা নিয়োজিত হইয়া তাঁহারই কার্য্য করিতেছেন। সকাম দেবোপাসনা এবং উহা হইতে লব্ধ সকাম দেবতা জ্ঞানই বিদ্যা। যে জ্ঞানদ্বারা মানব স্বকীয় উন্নতি লাভের চেষ্টা করে তাহাই দেবতাজ্ঞান তাহাই বিদ্যা। দেবতাজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও উহা সাধারণ মানব পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়; যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অনুপযোগী তাঁহার পক্ষে দেবতাজ্ঞান বিধেয়। সকাম দেবতাজ্ঞান অপেক্ষা আত্মজ্ঞান অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

মুক্তি।

এস্থলে অমৃত শব্দে মুক্তি বা নির্ব্বাণ নহে কেবল অমরত্ব যাহা দেবতাগণ প্রাপ্ত হন। মুক্তি কেবল আত্মজ্ঞান হইতে হয় কিন্তু দেবতা উপাসনা ও দেবতা জ্ঞান দ্বারা কেবল দেবভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমৎভগবদগীতার নবম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি শ্লোকে কহিয়াছেন, যে যাঁহারা পিতৃগণের উপাসনা করেন তাহারা পিতৃ লোকে গমন করেন ও যাঁহারা দেবতার অর্চ্চনা করেন তাঁহারা দেবত্ব লাভ করেন এবং যাঁহারা আমার উপাসনা করেন তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। অতএব দেবতাজ্ঞান বা দেবোপাসনা হইতে মুক্তি হয় না কেবল দেবলোকে গমন করা যায়। দেবলোকই এস্থলে অমৃত।

অবিদ্যা সেবার ফল।

যাহারা কেবল অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা কেবল বিদ্যার উপাসনা করে তাহারা আরও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। অর্থাৎ যাহারা কেবল কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা স্বার্থপর হয়। যেমন কোন ব্যক্তি কেবল ধন, ক্ষমতা, যশ লাভের চেষ্টা করে এবং ঐ চেষ্টা কেবল স্বকীয় সাংসারিক সুখের জন্যই করে তাহারা ঐরূপ কর্ম্মকরণ ফলে নিতান্ত স্বার্থের বশীভূত

হয় এইরূপ লোক অতি শীঘ্রই পাপকার্য্যে রত হইয়া থাকে। পাপাচারণই অবিদ্যার ফল। অতএব তাহারা ইহ জীবনে অজ্ঞানান্ধকারে অভিভূত হয় এবং পরকালে অন্ধকারময় নিরানন্দ অসুরলোকে গমন করে।

সেইরূপ আবার যাহারা কেবল বিদ্যানুশীলন করে, অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্র বরুণাদি দেবতার প্রাকৃতিক কার্য্য সম্পাদনের জ্ঞান চর্চ্চা করে তাহারাও আত্মজ্ঞান রূপ আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া অন্ধকারে প্রবেশ করে। দেবতাজ্ঞান সকাম জ্ঞান কারণ উহা হইতে পার্থিব ফল লাভ হয়। অতএব ঐ জ্ঞান শ্রেয়তর নহে। বিদ্যানুশীলন করিয়া মন আত্মজ্ঞান বিরহিত হইয়া অজ্ঞানতারূপ পাপে পতিত হয়। এরূপ ব্যক্তির মন প্রকৃত জ্ঞান হইতে দূরে অবস্থিতি করে ও উক্ত জ্ঞানের অবহেলা করে ইহারা কেবল পার্থিব বিষয়েই লিপ্ত থাকে ইহাদের হৃদয় আত্মজ্ঞানের দিকে আকর্ষিত হয় না। ইহারাও ভুবর্লোক বা পিতৃলোকের নিরানন্দ ও অন্ধকার অংশে স্বার্থপরায়ণ মানবের গম্যস্থানে যায়। ইউরোপীয় আধুনিক নাস্তিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ জাগতিক শক্তিসমুচয়ের আলোচনা দ্বারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইয়াছেন। ইহাঁরাও এই শ্রেণীর লোক। বিদ্যার উপাসনা, দেবতাজ্ঞান ভিন্ন অপর জ্ঞান নাই এই বিশ্বাস হৃদয়ে নিহিত করিয়া, মানবকে আত্মজ্ঞান হইতে দূরে অপসারিত করে। উহার ফল কেবল বাহ্যিক জ্ঞান ও তজ্জন্য আত্মন্তরিতা ও পার্থিব বিষয়ে আসক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও শুভকর্ম্ম করণে অবহেলা হয়।

কেবল বিদ্যাচর্চ্চার ফল।

নবম শ্লোকের অর্থ এই যে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইটীর ফল এক নহে; উহা পৃথক শাস্ত্রজ্ঞগণ এই কথা বলিয়াছেন। একের ফল পাপাচরণ অপরের ফল বিষয়াসক্তি এই উভয় ফল বিভিন্ন হইলেও মানবের মনকে অজ্ঞানান্ধকারে অভিভূত করে। নবম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে অবিদ্যার উপাসক ও বিদ্যার উপাসক উভয়েই অন্ধকারে পতিত হয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। দশম শ্লোকে বলা হইয়াছে এই দুই উপাসনার ফল পৃথক অর্থাৎ অবিদ্যার ফল পাপাচরণ ও বিদ্যার ফল বিষয়াসক্তি ও আত্মজ্ঞানের অভাব। একাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে উভয়ের একত্র আচরণে দেবলোক প্রাপ্তি হয়।

মানব মৃত্যুর পর প্রথমতঃ পিতৃলোকে গমন করে, যাহারা পাপী তাহারা অধিক সময় ঐ লোকের অন্ধকারময় নিরানন্দ স্থানে অধিক দিন বাস করে, তৎপরে পিতৃ-লোকের উৎকৃষ্ট অংশের ও দেবলোকের মধ্য দিয়া নিদ্রিত অবস্থায় গমনান্তর পুনশ্চ জীবাকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। যাঁহারা পুণ্যাত্মা তাঁহারা পিতৃলোকের

নিরানন্দ অংশ নিদ্রিত অবস্থায় গমনান্তর পিতৃলোকের বক্রী অংশে ও দেবলোকে বহুদিন কাটাইয়া পুনশ্চ পৃথিবীতে আগমন করেন। এই দেবলোকে বাসই অমরত্ব লাভ। বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইএর একত্র উপাসনায় এই দেবলোকে বাস বা অমরত্ব লাভ হয়। বেদে ও অপরাপর শাস্ত্রে সাধারণ মানব পক্ষে দেবোপাসনা ও শুভকর্ম্মের বিধান আছে। যাঁহারা দেবোপাসনা করেন তাঁহারা পাপকার্য্য করিতে পারেন না; যাঁহারা শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের দেবোপাসনার প্রবৃত্তি অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অতএব এই দুই কার্য্যে মানবকে উত্তরোত্তর পবিত্র মার্গে লইয়া সকাম শুভকর্ম্মাবলম্বী করায়। উহার ফল অমরত্ব।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥১২॥
অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যেনস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩॥
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥১৪॥

যাহারা প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা অন্ধ তমসায় প্রবেশ করে যাহারা হিরণ্য গর্ভাদির উপাসনা করে তাহারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। সম্ভূতি উপাসনার ফল পৃথক ও অসম্ভূতি উপাসনার ফল পৃথক ইহা ঐ পণ্ডিতগণের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যাঁহারা ঐ তত্ত্ব আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যিনি জানেন উভয়ের একত্র উপাসনা কর্ত্তব্য তিনি সম্ভূতি দ্বারা বিনাশ অতিক্রম অসম্ভূতি দ্বারা অমৃত ভোগ করেন।

নবম হইতে একাদশ তিনটী শ্লোকে সকাম জ্ঞান ও সকাম কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে সকাম ভক্তির ফলাফল বিবৃত হইতেছে। সকাম জ্ঞান ও সকাম কর্ম্মে যেমন মুক্তিলাভ বা আত্মজ্ঞান হয় না সেইরূপ সকাম ভক্তিতেও আত্মজ্ঞান হয় না উহা কেবল মানবকে দেবোলোকে লইয়া যাইতে পারে ইহাই এই তিনটী শ্লোকের উপদেশ।

অসম্ভূতি অর্থে যাহার সম্ভূতি বা জন্ম হয় নাই উহাকে মূলপ্রকৃতি ও বলা যায়। ইহাই অবিদ্যা বা মহামায়া। ইহা সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে অবস্থিত এবং কল্পান্তস্থায়ী। সৃষ্টির বাসনা পরমেশ্বরের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বিদ্যমান এবং ইহা হইতেই সৃষ্টি হইতেছে এজন্য ইনি সৃষ্টির অধীন নহেন অতএব ইহাকে জন্ম রহিত বলা হইয়াছে। মানব হৃদয়ে যে কিছু বাসনার উদয় হয় তাহার সমস্ত বীজ প্রকৃতিতে নিহিত এবং তাহা হইতে উত্থিত হয়; প্রকৃতিই

অসম্ভূতি।

বাসনার কারণ এবং বাসনা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মানব যে সকল পাপাচরণ করে তাহা অবিদ্যা বা প্রকৃতি জনিত। অতএব প্রকৃতির উপাসনায় মানব শুভফল প্রাপ্ত হয় না ঐ উপাসনায় কেবল অশুভ কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত হয়। মনে কর অর্থলাভের বাসনা আমার হৃদয়ে আছে আমি সেই বাসনা চরিতার্থ জন্য যে পূজা বা আরাধনা করি তাহাই প্রকৃতির আরাধনা এবং প্রকৃতি সেই আরাধনার ফল আমাকে প্রদান করেন। সুতরাং আমি ক্রমাগত ধনোপার্জ্জন করিতে লাগিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে নিষ্কাম দেবোপাসনা না করিয়া হৃদয় নির্ম্মল না হইয়া বরঞ্চ ক্রমাগত অসদুপায়ে ধন লাভের ইচ্ছা বলবতী হইয়া কুপথ অবলম্বনে আমাকে প্রবৃত্ত করিতে লাগিল। সুতরাং অজ্ঞানাত্মক অন্ধকারে উত্তরোত্তর পতিত হইতে লাগিলাম। ইহাই প্রকৃতির পৃথক উপাসনার ফল।

সম্ভূতি অর্থে যাঁহার জন্ম হইয়াছে। সৃষ্টির প্রথমে পরমাত্মা পরমেশ্বর হিরণ্য-গর্ভকে সৃষ্টি করিলেন। তিনিই কার্য্য ব্রহ্ম তিনিই সৃষ্টির কার্য্য আরম্ভ করেন

সম্ভূতি।

তৎপরে দেবতাগণ সৃষ্ট হইয়া তাঁহার সংযোগে বিশ্ব জগতের ক্রমোদ্ভব কার্য্য সম্পাদিত করিতে লাগিলেন। এই হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণই সম্ভূতি নামে এস্থলে আখ্যাত হইতেছেন। হিরণ্য-গর্ভের উপাসনায় অনিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়। ঐ সকল ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে উহা কতকগুলি অমানুষিক ক্ষমতা। প্রকৃত পক্ষে উহা অমানুষিক নহে তবে বর্ত্তমান সময়ে তাহা সাধারণ মানবের নাই। ঐশ্বর্য্য ৮ প্রকার (১) অনিমা, পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইতে সমর্থ হওন (২) লঘিমা—তুলার মত লঘুত্ব প্রাপ্তির ক্ষমতা (৩) প্রাপ্তি—দূরস্থিত দ্রব্যাদি পাইবার ক্ষমতা; (৪) প্রাকাম্য—স্বেচ্ছামত কাম্য পদার্থ প্রাপ্তির ক্ষমতা (৫) মহিমা—পর্ব্বতাদির ন্যায় বৃহত্ব লাভের ক্ষমতা; (৬) ঈশিত্ব—সকলকে শাসন করিবার ক্ষমতা, (৭) বশিত্ব—সকলকে বশে রাখিবার শক্তি (৮) কামাবসায়িতা অপ্রতিবন্ধ ইচ্ছা শক্তি প্রাপ্তি। এক্ষণে অনায়াসেই বোধগম্য হইবে যে কেবল প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা বাসনার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং কেবল হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা দ্বারা অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া স্বার্থ সাধনের পথ সুগম হইবে। অতএব এই দুই উপাসনাই সকাম ভক্তি প্রসূত; ঐ উপাসনাদ্বয়ের ফল পৃথক হইলে উহা উভয়ে স্বার্থপরতায় অর্থাৎ অদর্শনাত্মক অন্ধকারে লইয়া যাইবে। এজন্য এই উভয়ের পৃথক উপাসনা বর্জ্জনীয়।

উভয় উপাসনার একত্র অনুসরণ দ্বারা প্রকৃতি ও হিরণগর্ভের একত্ব জ্ঞান লাভ হইবে; এবং তদ্বারা স্বার্থপরতার নাশ হইয়া দেবলোকে গমন করিতে পারিবে বা

অমরত্ব লাভ করিবে। যদিচ ঐ পথ আত্মজ্ঞানান্বেষীর পক্ষে অবিধেয় সাধারণ মানবের পক্ষে উহা শুভকর উহা তাহাকে দেবলোক বা স্বর্গে উত্তোলন করিবে।

উপরোক্ত ছয়টী শ্লোকে প্রবৃত্তি মার্গের ফলাফলের কথা উক্ত হইয়াছে এক্ষণে নিবৃত্তিমার্গ উদ্‌ঘাটন জন্য পরব্রহ্মকে সম্বোধন করা হইতেছে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫॥

সুবর্ণময় বা জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা ব্রহ্মের প্রাপ্তিমার্গ আবৃত হে জগৎ পোষক ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ঐ আবরণ উন্মোচন কর।

প্রবৃত্তি মার্গে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, অতএব উপাসক এক্ষণে নিবৃত্তি মার্গ অনুসরণ জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

হিরণ্ময় পাত্রের অর্থে ধনলোভরূপ আবরণ দ্বারা, বিষয় বাসনা দ্বারা, ব্রহ্মজ্ঞান আবৃত হে জগৎপোষক! হে পরব্রহ্ম তাহা অপসারিত কর আমরা তোমার সত্যরূপ অবলোকন করি। বিষয় ভোগ লালসায় আমরা ব্রহ্মজ্ঞানে বঞ্চিত, উহা আমাদের হৃদয় হইতে দূরীকরণ দ্বারা হে পরমেশ্বর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের মার্গ উদ্‌ঘাটন কর।

হিরণ্ময় পাত্র।

ইহার অপর অর্থ এই যে এই বিশ্বসংসারকে আমরা যেভাবে দেখি তাহাতে ইহা আত্মজ্ঞানকে আবৃত রাখে। অর্থাৎ বিশ্বসংসারকে ঈশ্বর হইতে পৃথক ভাবিয়া ইহাকেই পরম বস্তু জ্ঞান করিলে উহা আত্মজ্ঞানের আবরণ স্বরূপ হয়। এই বিশ্বসংসার সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি সংযোগে আমরা দেখিতে পাই সূর্য্যের রশ্মি ইহাতে পতিত হইয়া ইহাকে দীপ্তিমান করিয়াছে, ইহাই জ্যোতির্ম্ময় আবরণ। এই সংসাররূপ আবরণ উন্মোচন করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ হইবে। এই উভয় অর্থেরই মূলে সে একভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়; বিষয় বাসনা অপসারিত হইলে প্রবৃত্তি মার্গ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো,
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ১৬॥

হে জগৎ পোষণকারী হে একাকী গমনশীল হে সর্ব্বসংযমকারিন্ প্রজাপতিতনয় সূর্য্য তোমার তেজ সম্বরণ কর তোমার কল্যাণতম রূপ দর্শন করি। আমিই এই সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ।

পূষণ অর্থে সূর্য্য—যিনি জগতের পোষণ করেন। পূষণ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শ্লোকে এই শব্দ পরমাত্মা ও সূর্য্য এই দুই অর্থই বুঝা যায়; এই শ্লোকে ইহার সূর্য্য অর্থ লইয়াই ভাষ্যকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন অতএব আমরাও সেই অর্থ এখানে ব্যবহার করিলাম।

পূষন্।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে সূর্য্যই সৌরজগতের প্রাণ স্বরূপ উহাই সৌর-জগতের সর্ব্বশক্তির আধার। এই জগৎ, তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তির দ্বারা চালিত সেই সকল শক্তিই সূর্য্যমণ্ডল হইতে সৌরজগৎ প্রাপ্ত হইতেছে। এমন কি যে শক্তির বলে আমাদের প্রাণ ধারণের কার্য্য সম্পাদন হইতেছে সে সমস্তই আমরা সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত হইতেছি। সূর্য্য না থাকিলে এজগতের অস্তিত্বই থাকিত না। এজন্য প্রাচীন শাস্ত্রকারগণও সূর্য্যকে জগৎ পোষক নামে অভিহিত করিয়াছেন। একর্ষে তিনি একাকী গমন করিতেছেন; পৃথিবীর পোষণ কার্য্য তিনি একাই করিতেছেন। যম—সর্ব্বসংযমকারী, সকল শক্তির দমন বা সংহার তিনিই করেন। সূর্য্য—রসগ্রহণকারী প্রজাপতিতনয়।

সূর্য্যই নিজ রশ্মি ও তেজ বিস্তার করিয়া আমাদের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইয়া আমাদের নিকট অসৎ বস্তু জগৎ প্রকাশ করিতেছেন এবং সেই জগতের বাহ্যরূপ প্রকাশ দ্বারাই জগতের প্রকৃত ব্রহ্মরূপ আবৃত রাখিয়াছেন। অতএব সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা হইতেছে যে হে সূর্য্য তোমার রশ্মি সম্বরণ কর যাহাতে আমি তোমার কল্যাণতম রূপ দেখিতে পাই। জগৎ সংসার আমার চক্ষু হইতে পরমাত্মার মঙ্গলময় মূর্ত্তি আবৃত করিয়াছে। তোমার রশ্মি সংযত কর যে আমি সংসার সম্বন্ধে অন্ধ হই এবং সূর্য্যমণ্ডলস্থ আদিত্য পুরুষকে দেখিতে পাই। আমিই সেই পুরুষ এই জ্ঞান আমার যেন হয়।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর
কৃতং স্মর ॥১৭॥

এক্ষণে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত; আমার প্রাণ বায়ু অমৃতময় মহাবায়ুতে মিশ্রিত হউক; আমার দেহ ভস্মীভূত হউক। হে মন নিজ কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর ও কর্ত্তব্য স্মরণ কর।

আত্মজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা করিয়া উপাসক মৃত্যুকালে কি করিবেন তাহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। আমাদের শরীরাভ্যন্তরে যেরূপ সমুদয় দেহব্যাপী প্রাণ বায়ু

আছে সেইরূপ শরীরের বাহিরে জগৎব্যাপী প্রাণবায়ু আছে। জীব এই অনন্ত প্রাণবায়ু হইতে নিজ প্রাণ বায়ু জীবদ্দশায় ক্রমাগত আকর্ষণ করে তাহা হইতেই জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়। মনে কর যেন আমরা জীবন সমুদ্রে ভাসিতেছি এবং জীবন সমুদ্রের জল আমাদের শরীরের প্রত্যেক কণাকে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে ইহাই প্রাণময় কোষ কিন্তু ইহা কোষের ন্যায় দেহকে আবৃত রাখে নাই; ইহা প্রত্যেক জীবানুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহাকে জীবিত রাখিতেছে। আমাদের শরীরের কোন অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলে বুঝিতে হইবে উহা হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। প্রাণবায়ু জীবদেহ হইতে একেবারে বহির্গত হইলে জীবের মৃত্যু হয়। উক্ত প্রাণবায়ু নষ্ট বা ধ্বংস হয় না উহা জাগতিক প্রাণ বায়ুতে মিলিত হয়। তাহাই এস্থলে উক্ত হইতেছে আমার প্রাণ অমৃত অর্থাৎ কল্পান্তস্থায়ী প্রাণ বায়ুতে মিশ্রিত হউক। আমার দেহ ভস্মীভূত হউক।

মৃত্যু।

হে মন এই সময়ে তুমি পরমাত্মা পরমেশ্বর ( ওঁ ) স্মরণ কর এবং নিজকৃত কর্ম্ম ও স্মরণ কর। অন্তকালে ঈশ্বর স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে মুক্তি হয় এবং সেই সময়ে নিজকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিতে পারিলে তাহার শুভাশুভ ফলের বিষয় চিন্তা করিতে সমর্থ হইলে পরজন্মে অশুভ কর্ম্মের প্রতি বিরক্তি উদ্ভব হইবে। অতএব ঐ সময়ে এই দুইটী বিষয়ই স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

মৃত্যুকালে কর্ত্তব্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে বলিতেছেন :— যিনি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিবেন তিনি আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব মৃত্যুকালে যাহাতে ঈশ্বর স্মরণ হয় তাহা করা অতীব বিধেয়, কিন্তু যাহারা জীবদ্দশায় জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিবার সময় সদাসর্ব্বদা পরমেশ্বরের স্মরণ করে নাই, যাহারা সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে ও ভোগ বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে বিরত থাকে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে অন্তিম কালে ঈশ্বরকে ভক্তির সহিত স্মরণ করা ও তাঁহার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করা অতীব দুঃসাধ্য। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতার অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন আমাকে সদাসর্ব্বদা স্মরণ করিবে। সংসার রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে সতত নিযুক্ত থাকিয়াও পরমাত্মাকে অহরহঃ ভক্তির সহিত চিন্তা করিবে এবং এইরূপ আজীবন করিলে তবে মরণ সময়ে ঈশ্বর স্মরণ অনায়াস সাধ্য হইবে। নতুবা প্রাণত্যাগ কালে কেবল নিজ সংসারের

সুখদুঃখ ও স্ত্রী পুত্রের ভাবনা ভাবিতেই কলেবর ত্যাগ করিবে; সুতরাং তোমাকে নিজ পাপপুণ্য ফল ভোগ জন্য কিয়ৎকাল ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকে থাকিয়া পুনরায় জরামরণ দুঃখাক্রান্ত এই মর্ত্তলোকে আগমন করিতে হইবে।

আগ্রহের সহিত উপরোক্ত প্রার্থনা করা হইতেছে এজন্য পুনরুক্তি করা হইয়াছে, উহা আগ্রহের লক্ষণ।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো,
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥১৮॥

হে অগ্নি! কর্ম্মফলভোগ জন্য আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও; হে দেব তুমি আমাদের কর্ম্ম জ্ঞাত আছে, আমাদের মন মধ্যে যে প্রবঞ্চনাত্মক পাপ আছে তাহা ধ্বংস কর আমরা পুনঃপুনঃ তোমাকে নমস্কার করিতেছি বা তোমার ভূরিভূরি স্তুতিগান করিতেছি।

উপাসক এ পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হন নাই, এক্ষণে মৃত্যুকাল উপস্থিত সুতরাং অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যেন ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকের মধ্যে সুগম পথ দ্বারা তাঁহাকে গন্তব্য পথে লইয়া যাওয়া হয়।

উপাসক মৃত্যুকালে পরমাত্মার স্মরণ করিতে না পারিয়া অগ্নির স্তুতি করিতেছেন। তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিতে অসমর্থ সুতরাং তাঁহাকে পিতৃলোক বা ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকের মধ্য দিয়া পুনরায় মর্ত্তলোকে আগমন করিতে হইবে। পাপ পুণ্যানুযায়ী তাঁহাকে অল্পাধিক কাল ঐ দুইলোকে বাস করিতে হইবে। যাঁহার পাপ কর্ম্ম অধিক তাঁহাকে অধিকদিন ভুবর্লোকে ও স্বল্পকাল স্বর্গলোকেও যাঁহার পুণ্যকর্ম্ম অধিক তিনি অধিককাল স্বর্গলোকে বাস করিয়া পৃথিবীতে অনুরক্তি বশতঃ পুনশ্চ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ গমনাগমনের জন্য তাঁহাকে সুগম পথ দ্বারা লইয়া যাইবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। অগ্নিই পৃথিবীতে ব্রহ্মতেজের প্রতিনিধি তিনি আমাদের পাপপুণ্য সমুদয় বিদিত আছেন। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না; অগ্নি কেবল আমাদিগকে সুখ গম্য মার্গ দিয়া লইয়া যাইতে পারেন; এবং তিনি আমাদের হৃদয় হইতে পাপের বীজ নষ্ট করিতে পারেন। তিনি তাহা করুন ইহা উপাসক প্রার্থনা করিতেছেন। এবং তজ্জন্য পুনঃপুনঃ অগ্নিকে নমস্কার করিতেছেন।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হরিঃ ওঁ

ঈশোপনিষদ শেষ হইল। পরব্রহ্মের স্মরণান্তর শান্তি প্রার্থনা হইতেছে

সমাপ্ত।